অমিয়ভূষণ মজুমদার

নিউ-লিট পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

অধ্যাপক শ্রীমান নবকুমার নন্দী

চিরঞ্জীবিতেষু

এটা রাজনীতির উপন্যাস নয়। রাজনীতি সম্বন্ধে যদি কিছু বক্তব্য লেখকের থেকে থাকে এ উপন্যাসে—তা এই, রাজনীতি বাস্তুহারাকে বাস্তু ফিরিয়ে দিতে জানেনা।

ঝিমিকে বাংলাদেশের প্রতীকরূপা ভাবা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য নয়।

গ্রন্থকারস্য

গল্পটা না ব'লে উপায় নেই। কারণ চেতনায় অন্য কারো জীবনের ছায়া যদি মুহূর্তের জন্যও পড়ে তবে সে বাইরের বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ছায়াটাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা, তা নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কথায় গল্পটা ব'লে ফেলা। আমাদের চেতনা শুক্তির মতো কেন ছায়াটিকে আত্মস্থ করার চেষ্টায় মুক্তা তৈরী করে না তা অন্য কথা।

বিশ্লেষণটা হয় বুদ্ধির সাহায্যে। বুদ্ধি যুক্তিজীবি। খণ্ড খণ্ড ধারণাকে যুক্তির সাহায্যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ব'লে দেখায় সে। মানুষ এবং বেদনার্ততাকে সে সংযুক্ত ক'রে বলে 'মানুষ হয় বেদনার্ত।' তারপর সে ভাবে আর বলে, মানুষ কেন বেদনার্ত হয়। আর তা সে করে কথা দিয়ে।

কথা, কথা। গল্প কি বলা যায়? এখানে প্রতিটি শব্দই একটি খণ্ড প্রত্যয়কে ধ'রে আছে। প্রত্যয়ের নামরূপ কথা। প্রতিটি প্রত্যয়ই দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধের বাঁধনে বাঁধা। এ দিয়ে মানুষের দেহটাকে গ'ড়ে তোলা যায়, তাকে সচেতন করা যায় না। বুদ্ধির সাধ্য কি তার এই কথার ইটে জীবন-বেগ গ'ড়ে তোলে?

তা যদি হ'তো, ইস্কুল মাস্টারের বউ বিমি বলতে পারতো, অন্তত বুঝতেও পারতো, এই দুপুরে কেন সে কালো-পথটাকে পার হ'য়ে হ'য়ে এই রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে এসে বসেছে। আর এক সপ্তাহে এই তৃতীয় দিন। বার বার তিনবার।

বিমি, বিমলা, বিমলপ্রভা।

আমাদের এই উনষাট খ্রীষ্ট বৎসরে বসন্ত ব'লে কোন ঋতুকে সাহিত্যে আনতে চাই না। কারণ বসন্তের সঙ্গে যে স্মৃতিগুলি সেকালের কবিরা জড়িয়ে রেখেছেন আমাদের এই ফাল্গুন মাসের বর্ণনা করতে গিয়ে যদি সেগুলি মনে আসে তবে সেটা নষ্ট হবে, এখানেও ভ্রষ্ট হবো। এটা এখন তা সত্ত্বেও বসন্ত। শীতের আমেজ নেই, তা নয়। রৌদ্রে স্নান করা পরিচ্ছন্ন প্রান্তর। দুপুর পার হয়েছে। এখন প্রান্তরটা রোদ পোয়াচ্ছে যেন। আর তা ভালোও

লাগে। বিমি এখন যাকে বাড়ী বলে সেখানে এই দুপুরে রোদ নেই। এই প্রান্তরে আছে।

দূর্বা জাতীয়ই হবে প্রান্তরের আচ্ছাদন। কেমন যেন কাঠি কাঠি। কোমল ও নমনীয় নয়। বরং ক্ষণভঙ্গুর, পুট পুট ক'রে ভেঙ্গে যায় হাতে ক'রে তুলে নোয়াতে গেলে। মাটি বোধ হয় তেমন উর্বর নয়। উর্বর হ'লে কি চাষ না ক'রে ফেলে রাখতো—এত বড়ো একটা মাটির চত্বরকে ?.

যেখানে সে বসেছে তার অদূরেই লতাকুলের একটা ঝোপ। ফল থাকার কথা নয়। পাতাও কম। কাঁটা আছে। আর কাঁটা ও পাতার উপরে ধুলো। এই কাঁটা বেয়ে বেয়ে সোনালীরঙের একটা পরগাছা উঠেছে। একেবারে খালি খালি লাগতো বিমলার যদি এই ঝোপটা না থাকতো।

প্রান্তরটা তাই ব'লে প্রকৃতির হাতে নেই। চোখ তুলে তাকাতেই সে কাঁটা-তারের ঘেরটা দেখতে পেলো। ঘেরটা এখন নিশ্ছিদ্র নয়। কোথাও কোথাও একেবারেই লোপ পেয়েছে। লোহার খোঁটাগুলোরও সব নেই। সতরো বছর ধ'রে রোদজলে টিকে থাকার কথা ভাবতে গেলে লোহাকেও দোষ দেয়া যায় না। ভিতরে এখনও সারি সারি তাঁবু। সেগুলিও বয়োজীর্ণ। কোন কালে কি রং তার ছিলো এখন তা ভেবে লাভ নেই। এখন সব এক রং—কালচে ধূসর বলা যায়, কিন্তু আসলে সে রং পচনশীলতার। সেগুলোকে সতরো বছর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে নাকি ?

এখানে সৈন্যবিভাগের একটা বড়ো রকমের ঘাঁটি ছিলো। কি করতো তারা ? কি উদ্দেশ্য ? রাজপথ তৈরী ?— না রাজপথ দিয়ে যে বাহিনী চলাচল করবে তাদের গতি নির্দেশনা ? বেয়াল্লিশে বসেছিলো পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত ছিলো।

আর এটা যে সৈন্যদলের ঘাঁটি ছিলো তা অন্য কেউ না ব'লে দিলেও বোঝা যায়। কয়েকটি হাওয়া জাহাজের মোচড়ানো দোমড়ানো ভগ্নাবশেষ এখনও প'ড়ে আছে প্রান্তরের দক্ষিণ সীমা ঘেঁষে। মনে হয় যেন তারা জড়াজড়ি ক'রেই মরেছিলো। হয়তো তা সত্য নয়।

এটা এখনও একটা ঘাঁটি। বাস্তহারাদের। তাঁবুগুলোতে তারা থাকে। ছ'হাত বাই চার হাত তাঁবুতে এক একটি পরিবার। এমন অনেক পরিবার। আর কিছু দূরে বাঁশের বেড়া আর খড়ের ছাদ দিয়ে তৈরী কয়েকখানা ঘর। ক্যাম্পের দপ্তর।

হলুদমোহন ক্যাম্প। এক সময়ে হলুদমোহন হাটের খ্যাতি ছিলো। এখন এই ক্যাম্প।

চোখ তুলে তাকালো সে। শব্দটা গুর্ গুর্ ক'রে এগিয়ে আসছিলো। এবার হুইসিলটাও শোনা গেলো। সাড়ে তিনটের গাড়িটা। বিমলার চোখের সামনে কিছু দূরে রেলের গুমটি ঘর। সে দেখতে পেলো লেভেল-ক্রসিংয়ের দরজা বন্ধ করা। এপারে গাড়ি ঘোড়া লোকজন নেই। ওপারে একটা মোষের গাড়ি খাড়া করা আছে। একটা মোষ ধুঁকে ধুঁকে দম নিচ্ছে। গুমটি থেকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল লাইনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে আছে। এই দেখতে দেখতেই ইঞ্জিনটা এসে গেলো। চোঙ থেকে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছেড়ে দিলো। আর সেই ধোঁয়ার তোড়ে প'ড়ে ফুল সমেত কৃষ্ণচূড়া ডালটা ঝড়ে যেমন হয় তেমনি উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে অস্থির হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হ'য়েই গেলো। ইঞ্জিনটাকে কিছু দূরে অনুসরণ ক'রে তার দৃষ্টিটা আবার ফিরে এলো। ধোঁয়ার স্তম্ভটা ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু জায়গাটা বোঝা যায়। দু-একটা শুকনো পাতা কিংবা ফুলের পাঁপড়ি তখনও পাক খাচ্ছে গাছটার উপরে। ধোঁয়ার তোড়ে উপরে উঠে পড়েছিলো, এখন পাক খেয়ে খেয়ে নামছে। এর আগেও ঠিক এ দৃশ্যটাই চোখে পড়েছিলো তার। গাছের ডালটা যেন কিছুক্ষণের জন্য নিস্তেজ হ'য়ে ঝিমিয়ে পড়ে। আর এই দৃশ্যটা যেন তার অনেক পরিচিত। প্রায় মুখস্থ করা স্মৃতির মতো। কিন্তু কোথায়? কোথায় এবং কবে স্মৃতি সংগ্রহ করেছে তা মনে হচ্ছে না।

তার কোলের উপরে একটা উলের বল। কাঁটা দিয়ে সে কিছু বুনছিলো।

ক্যাম্প থেকে কে একজন বেরুলো। তার তখন মনে হ'লো—কেন এসেছি? প্রায় এক ঘণ্টা হ'লো বসেও আছি।

প্রশ্নটা উঠেছিলো লোকটিকে বেরুতে দেখে। সে তার ধারে কাছে দিয়েও এলো না। মাথা নিচু ক'রে বেরিয়েছিলো তেমনি ক'রেই নিজের পথ ধ'রে রাজপথে গিয়ে উঠলো। প্রশ্নটাও ঝিমিয়ে গেলো। কিন্তু প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে তার অগোচরেই উত্তরের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রস্তুতি চলছিলো। উত্তরের প্রয়োজন হ'লো না। কিন্তু তাই ব'লে সে অংশের আলোড়নটাও থামলো না। আর সে অংশে এই প্রত্যয় ছিলো যে এরা দণ্ডকারণ্যে যাবে।

সে ভাবলো: দণ্ডকারণ্য না জানি কেমন জায়গা। সেখানেই এরা যাবে।

যাবে নয় ঠিক, যেতেই হবে। ওটা হয়ত গুজব যা রটেছে। কিন্তু মূলে সত্য আছে? হাওয়াই-জাহাজ নামানোর জন্যেই দরকার হ'য়ে পড়েছে এই প্রান্তর। এবং সেজন্যেই এ ক্যাম্পটিকে আগে তুলে দেয়া হবে।

সে আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো। যুদ্ধ, এই শব্দটাকে অবলম্বন ক'রে তার মন এদিক ওদিক খানিকটা হাতড়ে চ'লে তারপর এই ধারণাটায় পৌঁছুল: আবার যুদ্ধ বাধবে নাকি? কিন্তু এটা তার মনের ঈপ্সিত বিষয় নয়। হাই উঠলো তার। তারপর সে চিন্তা করলো,—হ্যাঁ, যুদ্ধ কাকে বলে তা সে জানে। জানাটা খুব ঘনিষ্ঠই বলতে হবে। কিন্তু অনেক অতীতের ব্যাপার। তখনকার বেদনা কালের অনেক বাধা পার হ'তে হ'তে ক্লান্ত নিরুত্তাপ।

সতরো বছর হ'লো কম ক'রেও। তখন ষোলো ছিলো তার, এখন সে উত্তরতিরিশ। তখন নিশ্চয়ই মুখে এমন মেছেতার দাগ ছিলো না। শরীরও হাল্কা ছিলো। হাল্কা এবং নমনীয়, কিন্তু দুর্বল নয়। দুর্বল হ'লে সে টিকে যেতো না। তার দিদিকে নিশ্চয়ই তার চাইতে মজবুত দেখাতো। কিংবা উপমাটাই যেন সত্য হ'তে পারে। বাধাবিপত্তিকে সে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে —তাদের সম্মুখে নুয়ে নুয়ে পড়েছে ব'লেই। সে বাংলা দেশে পৌঁছুতে পেরেছিলো। দিদি পারেনি। রেঙ্গুন থেকে বজ্রযোগিনী।

দুঃখ নয়, শোক ক'রেও লাভ নেই। এত অতীত। কিংবা তারপরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে যার প্রখর স্পর্শের তুলনায় সেই রেঙ্গুন-বজ্রযোগিনীর প্রতিটি পদক্ষেপের রুদ্ধনিশ্বাস আকুতিগুলি মনে আর দাগ কাটে না যেন।

যুদ্ধ বৈ কি। সে খবরের কাগজ থেকে যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতো। আর বাবার মুখেও শুনতো। তারপর তার বাবা বললেন একদিন, তোমরা কালই যাচ্ছ। তুমি, তোমার দিদি, আর ভুবন। বাবা থেকে গিয়েছিলেন। কাঠের করেবার দেখার জন্যই; কিংবা বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছিলো একবার বেরিয়ে এলে আর ফেরা যাবে না। হয় তো তাঁর স্ত্রীর স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো বাড়িটাকে ত্যাগ করবার ইচ্ছা ছিলো না। ত্যাগ করতেও হয়নি। খারাপ সংবাদের যথাস্থানে পৌঁছে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতাই যেন প্রমাণিত হ'লো। মিত্রপক্ষ রেঙ্গুন দখল করার চেষ্টায় যে সব বোমা ফেলেছিলো, তাতেই বাড়ি সমেত তিনি নিঃশেষ হয়েছেন। সে যাই হোক, তার বাবা বলেছিলেন, কালই যাচ্ছ তোমরা। আর বলবার সময়ে তার বাবার মুখটা কেমন দেখিয়েছিলো

তাও মনে আছে তার। কিংবা বলা যায় তার বাবার সেই ভঙ্গিটাই একমাত্র যা মন ধ'রে রাখতে পেরেছে।

খররর্ ক'রে একটানা একটা শব্দ হচ্ছে। ঠিক তাই। এর আগের দু' বারেও এমন হয়েছিলো। হাসি ফুটবে যেন তার মুখে। এ সহরে বোধ হয় এটাই একমাত্র একা গাড়ি। মাল টানে? বড়ো বড়ো কয়েকটি চ্যাপ্টা চাংড়ি। পান হ'তে পারে কিংবা শাকসব্জী। চাবুকের ডাঁটটা চলন্ত চাকায় অর-কাঠে বাধিয়ে ওই শব্দটা তৈরি করছে চালক। উদ্দেশ্য পথচারীকে জানিয়ে দেয়া। কিন্তু মনে হয় সে যেন মনের স্ফূর্তিই প্রকাশ করছে। গতি, গতি। অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো বিমি। যেন গতির দোলাটা লাগলো তার স্মৃতির আধারে। তবু সে ভাবলো—গাড়িটা বোধ হয় নিয়মিত ভাবেই যাওয়া আসা করে। তার সময়েরও বোধ হয় ঠিক আছে। তার তা যদি থাকে তবে এখন উঠতে হয়। কারণ এর আগের দিন একাটা চ'লে যাবার পরে উঠে বাসায় পৌঁছে সে দেখেছিলো ভুবনবাবু স্কুল থেকে ফিরে বিষণ্ণমুখে তার অপেক্ষা করছে। কি দরকার—? কেন বিষণ্ণ হয়?

উঠে দাঁড়ালো সে।

এবার রাজপথ পার হ'তে হবে। এখন আর তেমন নির্জন নেই যেমন ছিলো দুপুরে, তার এদিকে আসবার সময়ে। দুপুরের স্তব্ধতার পরে আবার চলাচল সুরু হয়েছে। সঙ্কোচের মতো কিছু একটা অনুভব করলো সে, তারপর রাস্তাটা পার হ'লো। সঙ্কোচ নয় ঠিক, সঙ্কোচ অনুভব করা উচিত এই সংকীর্ণ ক'রে আনা বোধটাই যেন।

এ পথটা নির্জন থাকার কথা নয়। সে জানে এটা জাতীয় মহাপথ। পুব দিকে এগিয়ে গিয়ে এটা মিশেছে সেই চীনে যাবার পথে। সে যখন বজ্র-যোগিনীর দিকে আসছিলো তখন এ-পথ এমন মসৃণ হ'য়ে কোথাও ছিলো না। থাকলে—। যাক সে কথা। এটা একটা বিখ্যাত তেমাথা হ'তে পারতো। পুব-পশ্চিমে কালো পিচঢালা রাজপথ। উত্তর-দক্ষিণে রেলের লোহা পাতা। লোহার পাশে চুড়ির মতো সেকালের লাল সুরকির রাস্তা এখনও কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। তখনকার দিনে এ অঞ্চলের মানুষদের উত্তর-দক্ষিণেই ঝোঁক ছিলো, পুব-পশ্চিমে ছিলো মাটি-ঢাকা গেঁয়ো সড়ক। উত্তর-দক্ষিণের ঝোঁকটা হঠাৎ কেটে গেছে মানুষের। দক্ষিণ দিকে আরও আধ মাইল পর্যন্ত রেলপথ গেছে। তারপরও কিছুদূর লোহার পাটি পাতা আছে, জঙ্গলে ধারা

হারিয়ে যাওয়া নদীর মতো। ওধারে এখন পাকিস্তান—অন্যদেশ। উত্তর দিকের খবরও সে জানে। রেলপথ সেদিকে অনেক বাঁক নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে পাহাড়ী ঢালু বেয়ে উঠতে থাকে। কয়েকটি চা বাগানের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে এক মহকুমা শহরে। আগে মানুষ যেতো উত্তর-দক্ষিণে, এখন?

সঙ্কোচ হওয়ার তেমন কিছু নেই ভেবে দেখতে গেলে। আর এখন তো নয়ই কারণ সে ইতিমধ্যেই নিজেদের পাড়ায় পৌঁছে গেছে। নিজের পাড়ায় মেয়েরা এবাড়ি ওবাড়ি গিয়েই থাকে। রাজপথ ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়াটা অবশ্য—

কেন গিয়েছিলো সে এ রকম প্রশ্নটা এখানে আবার উঠতে পারে।

কিছুদিন আগেও এটা অনাবাদী নিচু জমি ছিলো। সেখানে একদল বাস্তহারা এসে বাস করছে। ওপারের ওই রৌদ্রতপ্ত প্রান্তর থেকে এসে এদিকের স্যাঁতসেঁতে ভাবটাই প্রথমে অনুভবে ধরা দেয়। সমগ্র পল্লীটা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে।

চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করার চেষ্টায় যে কোন উপকরণে ঘর তুলেছে। খড়, গোলপাতা, খোলা, ঢেউতোলা টিন, কত কি দিয়েই মানুষ ঘর তোলে, কিন্তু গাছের ছাল? এদিকে একটা প্লাইউড তৈরির কারখানা আছে। সেখানে তাদের পরিত্যক্ত কাঠের পাত কিনতে পাওয়া যায়, গাছের ছাল বলতে পারো। এ পল্লীটিতে তাও ব্যবহৃত। ঘন সন্নিবিষ্ট ঘরগুলি। আর গাছ? চিন্তাশীল মানুষের মনে হ'তে পারে এ পল্লীতে ইতিমধ্যে পুরাতনত্বের রোগবীজ সংক্রামিত। নতুন আর কি হবে? এদিক ওদিকের গ্রামে যা ছিলো এবং আছে বড়ো জোর তাই গ'ড়ে উঠতে পারে। আর তা থেকে দূরে স'রে যাবার উপায়ও নেই। তেমনি সব। শুধু বোধ হয় কতগুলি ব্যাপারে সঙ্কোচ কিছু কেটে গেছে। সঙ্কোচ নাকি কথাটা?

একটা উদাহরণ মনে এলো তার। বজ্রযোগিনীতে গরীব ছিলো, মধ্যবিত্ত ছিলো, অভাব ছিলো। কিন্তু নিজের অভাবকে মানুষ নিজের মধ্যেই রাখতো। তাকে দোকানের মতো সাজিয়ে বা পথে তাদের মিছিলের মতো চালিয়ে নিয়ে বেড়ানোর কথা কেউ ভাবতো না যেন। দেখা হ'লে কেমন আছ—এর উত্তর ভালোই আছি বলতো লোকে। এখন অচেনা লোকও যদি কুশল প্রশ্ন করে, তার উত্তরে তবে, আর বলেন কেন, ক্যাশডোল বন্ধ, দিন চলে না, বড়ো দুঃখে

আছি ইত্যাদি বলার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে। তখন সঙ্কোচ ছিলো? কোনটা স্বাভাবিক?

এমন অনেক উদাহরণই তুলে ধরা যায়। মেয়েদের পথে বেরুনোর দ্বিধা তার মধ্যে একটি। এ অঞ্চলটা যে শহরের উপান্ত তার পথে পথে এই বাস্তু-হারা পল্লীর অনেক মেয়ের সঙ্গেই তোমার দেখা হ'য়ে যেতে পারে। এ জায়গাটায় একটু চিন্তা করতে হ'লো তাকে। আগে সরকারের দপ্তর থেকে আগাম টাকা আদায় করা, মেয়েকে কোন অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার চেষ্টা, বা তেমনি সব উদ্দেশ্যে তারা ঘুরে বেড়াতো। এখন? গাঙ্গুলী মশাই-এর বড়ো মেয়ের মতো যদি হয়, বলা যায় রাজনীতি করে। রাজনীতিদলের হ'য়ে চাঁদার কৌটা নিয়ে বেড়ানোকে রাজনীতিই বলা যেতে পারে। সেন খুড়োর মেজোমেয়ের মতো যদি তানপুরা নিয়ে ঘোরা হয় তবে তার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু। অভ্যাস বলা যেতে পারে? সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এদের অনেকেই পথে পথে ঘুরছে। আট বছরের অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারছে না তার পরের চার বৎসরে?

অভ্যাস? অভিজ্ঞতাও বলতে পারো। বিমলারও আছে সে সব। বোধ হয় সে বিব্রত বোধ করলো। তার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হ'লো। বিরক্তির সময়ে যেমন হয়। কাছাকাছি কিন্তু পৃথক মনোভাবের ফলে একই রকমের রেখা পড়ে নাকি মুখে? ভাব প্রকাশের এ ব্যাপারটাও ঠিক মতো অধিকারে আসে নি মানুষের? বিশ্রী লাগা? অনির্দিষ্টভাবে অনেক কিছুই। এই স্যাঁতসেঁতে ভাবটাও। এত গাছ না লাগালে মানুষ বাস করে তা কি জানা যেতো না? এটা নিচু জায়গা। বছরে চার মাস জলে ডুবে থাকতো। বাঁধ দেয়া হয়েছে ওদিকে তাই জল আসে না। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে ভাবটা শুকায়নি।

দণ্ডকারণ্যেও অবশ্য অনেক গাছপালাই থাকবে। তা হ'লেও—। না, বরং গাছপালা থাকবে না। অরণ্য কি আর থাকবে? গাছপালা উড়িয়ে ফর্দাফাঁই ক'রে শহর বসবে। ট্রাকটর দিয়ে চাষের ব্যবস্থা হবে। আর তা যদি হয় বুলডোজার দিয়ে জঙ্গল উড়িয়ে দিতে কে আপত্তি দিচ্ছে? নিরাবরণ কুমারী উর্বরতা। নতুন হ'য়ে ওঠাও যেন। এমন একটি আবেগই তখন বিরাজ করতে থাকে।

নিজের বাসায় পৌঁছে সে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো। ভুবনবাবু আসেনি। ভালোই হয়েছে। এবার সে একটা কাজ করবে। বিছানাও পাতবে না,

চুলও আঁচড়াবে না। কারণ, সে নামের উপযুক্ত এক মাত্রটি ভুবনবাবুর শয্যা। পাতাই থাকে। স্কুলে যাওয়ার আগে নিজেই টানটোন ক'রে রেখে যায়। আর চুল আঁচড়ানোটা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ভুবনবাবু ইস্কুলে গেলে সে স্নান করে। তার আগে কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে চালিয়ে জট খুলে দেয় চুলের। যে কাজটা সে করতে চায় তা হচ্ছে আয়না দিয়ে নিজের মুখটাকে একবার দেখা।

আগ্রহটা যে কেন হ'লো তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। অথচ অনেক দিন, অন্তত মাস ছএক যা হয়নি, তা হ'লো।

সে নিজের মুখ দেখলো। নাকটা টিকলো, ছোট। নাকের বাঁদিকে উপরের ঠোঁটের উপরে তিলটা যেন আগের চাইতেও বড়ো হয়েছে। দু' গালেই কিছু কিছু মেছেতার দাগ পড়েছে। গায়ের রং তিন বছর আগে যে রকম দাঁড়িয়েছিলো তার তুলনায় যেন কিছু পরিষ্কার হয়েছে আবার। তা ব'লে পনরো ষোলো বছর আগে যা ছিলো তার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। সে কথা বলতে গেলে এও বলতে হবে, তিন চার বছর আগে হঠাৎ যেমন বুড়িয়ে উঠছিলো সে তার তুলনায় এখন তাকে তরুণতর দেখাচ্ছে। অন্তত সেই চোয়াল প্রকাশ পাওয়া চেহারাটা আর নেই। কিন্তু চোখের কোলের সেই ক্লান্তির কালিটা লেগেই আছে। আর মুখের চেহারা তরুণতর হ'লেও কানের পাশে দু'তিনটি সাদা চুল চিকচিক করছে। আর চোখ? চোখের দিকে চাইতেই সে দুটি টলোমলো ক'রে উঠলো আয়নায়। তার চোখের মণি কালো নয়। নীলও বলা যায় না তাকে। ফিরোজা রং বরং। সূর্যের আলো কখন কি ভাবে ধরছে তা যেন মণি দুটির দিকে চাইলে বোঝা যাবে। যেন আলো ধ'রে তারা বদলায়।

এ মণি দুটি নিয়ে তাকে কম নাকাল হ'তে হয়নি। রেঙ্গুনে থাকবার সময়ে বজ্রযোগিনীর কোন স্মৃতিই প্রায় তার ছিলো না, বিদেশ যাবার সময়ে এত কম বয়স ছিলো তার। কিন্তু তার সেই অপরিণত মনে শৈশব স্মৃতির যে দু-একটি রেখা ছিলো তার মধ্যেও একটি তার চোখ সম্বন্ধে। গ্রামের এক প্রতিবেশী বৃদ্ধা তার মাকে বলেছিলো—'এ চোখ তো ভালো নয়।'

'কেন, বেশ চোখ তো?'

'না বাছা, স্বামী টেকে না এমন সব মেয়ের।'

আয়নায় চোখ দুটি টলোমলো ক'রে উঠলো আবার। যেন মণি দুটির

পিছন থেকে কেউ চঞ্চল হ'য়ে কোন প্রশ্ন করতে চায়। খারেকের জন্ম দৃষ্টিটা কঠিন হ'য়ে উঠলো। সোনার ছুটি তারের মতো সূক্ষ্ম দেখালো মণি ছুটিকে। তারপর বোধ হয় এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার জন্যই সজল হ'লো।

আয়নাটা নামিয়ে রেখে ভুবনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে পৌঁছানোর আগে সে একবার বাইরে তাকালো। কালো রাজপথটা চোখে পড়লো। আর তার ওপারের প্রান্তরটার একাংশ।

নিজের ছোট ঘরখানার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে সে ভাবলো—দণ্ডকারণ্য খারাপ হ'তে গেলো কেন? খারাপই যে হবে তার কি প্রমাণ? গাঙ্গুলী মশাইএর বড়ো মেয়ে মালতী বলে বটে। তার কথা ধরতে হ'লে বলতে হয় ভালোও নয়, মন্দও নয়। এর চাইতে মন্দ আর কি হবে? কিন্তু নীতিটা দেখতে হবে তো। সমস্যার সমাধান করতে পারছি না, কাজেই ওদের সরিয়ে ফেলো চোখের সামনে থেকে। কিন্তু এগুলি তার মুখের কথা নয়। সে কথা ঝাঁজালো। বাম-দক্ষিণকে অবলম্বন ক'রে ঝাঁজ থাকে অনেক।

কি ভাবছি, ভেবেই বা কি লাভ? আর ঘরের ঠিক মাঝখানে এমনি কেউ দাঁড়ায় নাকি?—হ'লোই বা নিজের ঘর। কেউ দেখলে কি ভাবে? তার চাইতে জানলার গোড়ায় দেয়াল ঘেঁষে কিছু দেখার মতো ক'রে দাঁড়ানো কিংবা চৌকির উপরে বিশ্রামের ভঙ্গিতে বসা ভালো।

এমনি এমনি কি আর কোন কাজ হয় না? যুক্তি থাকবেই এমন কি কথা আছে? সব কাজের যুক্তি থাকে না। সে যে গিয়েছিলো এবং এক সপ্তাহে এই তৃতীয়বার, তা তো মিথ্যা নয়। যুক্তি দিতে গেলে তা টিকছে না কেন? ঘরটা স্যাঁতসেঁতে? মরণ! রোদ পোয়ানোর আর জায়গা নেই? রেলগাড়ি যাওয়া দেখতে? উত্তর না দিলেও চলে। যুক্তি দিতেই হবে তার কি মানে আছে। আর প্রশ্নই বা করছে কে?

নিজের ডান হাতটা বাঁ হাতের উপরে রাখলো সে। ডান হাতটা—এখন একটু একটু মাংস লেগেছে আবার। কিন্তু শিরা ঢাকেনি। ও আর কোনদিন ঢাকবেও না। একেবারে আগের মতো—তা' হয় না।

জেলেবউকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করা যেতো সে যাবে কি না। যাবেই। সকলকেই যেতে হবে। আর গেলে হয়তো ভালো হবে।

নিজেই বুঝতে পারছে না কেন সে গিয়েছিলো। হয়, বলতে হয় এটা একটা অযৌক্তিক ব্যাপার কিংবা তেমন একটা ব্যাপার যা যুক্তি দিয়ে মাপতে

গেলে নিরর্থক। বুকের ভিতরে গরম কি একটা বোধ হয় বটে কিন্তু সেটার কোন নাম আছে কিনা মনে পড়ছে না। নাম নেই বোধ হয়। আর দেখো দেখি পাড়ার লোক ইস্কুল মাস্টারের বউ ব'লে তাকে খাতির না ক'রলেও একেবারে অগ্রাহ্য ক'রতে পারে না।

কিন্তু এখন ব'সে থাকলে হবে না। চায়ের জলটল করতে হবে।

ইতিমধ্যে আলো জ্বালিয়েছে সে। ভুবনবাবুর ঘরের টেবিলে সেটা জ্বলছে। তার নিজের ঘরে আলো জ্বালায় না। প্রয়োজন মতো রান্নাঘরের কুপিটায় কাজ সেরে নেয়। পয়সার কিছু সাশ্রয় হয়। তার ফলে সন্ধ্যার পর থেকে বাড়িটার অন্যত্র চাঁদের আলোই একমাত্র আলো হ'তে পারে, কিন্তু কদিনই বা চাঁদ ওঠে? এতে তার খুব একটা অসুবিধাও হয় না।

ভুবনবাবুর সাড়া পাওয়া গেলো। খবরের কাগজ নিয়েই ফিরেছে সে। এবার সে কাগজ নিয়ে বসবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যন্ত পড়বে। রাত দশটা পর্যন্ত পড়া চলে। তারপরে আহারের ব্যবস্থা। বিশেষ ক'রে এ মাসে আহারের ব্যবস্থাটা খুব সাদাসিদে। এটা বহাল করেছে বিমলা নিজেই। ভুবনবাবু একটা হাজার টাকার পলিসি করেছে। কাগজখানা তার হাতে দিয়ে ভুবনবাবু বলেছিলো, 'রাখো।'

'কি, এটা?'

ভুবনবাবু একটু ইতস্তত ক'রে বলেছিলো, 'মানুষের শরীর। আমার কিছু একটা হ'লে এটা তোমার কাজে লাগবে।'

মনে হয়েছিলো কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু একটা কথাও না ব'লে সে পলিসির কাগজখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। ভুবনবাবুও যেন বলবার কথা আর খুঁজে পেলো না। বিমলা পলিসিটা নিয়ে তার বিছানার নিচে রেখে দিয়েছিলো। এখন হয় তো সেখানেই আছে।

ভুবনবাবু নিজের উপার্জনের অর্থ খুশিমতো খরচ করতে পারেন। কিন্তু উপার্জনের মোট অঙ্কটা এমন কিছু নয়। এবং সে টাকা দিয়ে এ বাড়িটা তুলবার সময়ে সরকার যে ধার দিয়েছিলো তা শোধ করতে হয়, সংসারও চালাতে হয়। পলিসির কথাটা ভুবনবাবু আগে তাকে বললে হয়তো সে নিষেধ করতো। তা হয়নি। কিন্তু ধার বাড়বে এতে যদি সংসারের অনিবার্য কোন কোন খরচকেই নিবারণ না করা হয়। অগত্যা রাত্রির আহারকে আরও সাদাসিদে করতে হয়েছে।

আর এটা নতুনও নয়, ভুবনবাবুর এই ভবিষ্যৎ চিন্তা।

বজ্রযোগিনীতে যখন তারা অবশেষে পৌঁছেছিলো ঠিক তখন তখনই কোন বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করার মতো অবস্থা ছিলো না। একটা আদিম অবস্থায় যেন তারা পৌঁছে গিয়েছিলো। রাত্রির নিদ্রা এবং দিনমানের আহার এ ছাড়া অন্তত এক সপ্তাহ তারা কিছুই ভাবেনি। গায়ে জ্বর, হাতে পায়ে ঘা। ক্লান্তির কথা ব'লে লাভ নেই। কারণ সে মুহ্যমান অবস্থাকে বোঝাতে ক্লান্তি কথাটা বেশ কিছু অগভীর। প্রায় এক সপ্তাহ পরে তারা কেঁদেছিলো। ক্ষতিটা কার বেশি? যাই হ'ক, শোকপর্বটা এক সময়ে শেষ হয়েছিলো। আর তার কিছু পরে ভুবনবাবু ভবিষ্যতের কথা বলেছিলো।

অনেক পুরনো কথা। নাড়াচাড়া ক'রে লাভ নেই। কিন্তু কতগুলি কথা আছে যা ঘুরে ঘুরে মনে আসে, কিছুক্ষণ থেকে আবার কিছুদিনের জন্য বিদায় নেয়। ভুবনবাবুর পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা একটা প্রস্তাবের রূপ নিয়ে এসেছিলো। 'বিমল, তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।'

'বিয়ে? কেন?'

'বিয়ে হয় মানুষের। আমার হয়েছিলো, তোমার দিদির হয়েছিলো।'

'তা হয়েছিলো।'

'পাত্র খোঁজ করছি।'

রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলো তখন বিমলা। 'পরে বলবো' বলে সে চ'লে গিয়েছিলো। রাত্রির রান্না শেষ ক'রে হেঁসেল থেকে বেরিয়ে সে ভুবনবাবুর কাছে গিয়েছিলো। তখন ভুবনবাবু ইস্কুল মাস্টারি করতো না। পৈতৃক জমিজমার যা অনুপস্থিতিতে নষ্ট হ'তে বসেছিলো তা আবার গুছিয়ে নিচ্ছিলো।

'এখন খাবে নাকি?'

'একটু পরে হ'ক।'

ভুবনবাবুর চৌকির কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিলো সে।

বিমলাই বললো: 'আমার পিতৃবংশের খোঁজখবর নেয়ার কথা ছিলো।'

'নিয়েছিলাম।'

'এত ছোট উত্তর?'

'তাঁরা, মানে তোমার জ্যেঠামশাই এবং কাকা, তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।'

'আর আমরা কি খ্রীষ্টান?'

'তা অবশ্যই নয়। তবে ধরো, আহার বিহার ধরনধারন, আমরা খানিকটা পৃথক হ'য়ে পড়েছি বলা যেতে পারে। রেঙ্গুনে খানার টেবিলে বসতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। এখানেও আহারটা আমাদের খুব সাত্ত্বিক নয়। আর ওই ছবিটার কথাই ধরো। ইলাসট্রেটেড্ উইকলিতে অনেক ছবিই ছিলো তার মধ্যে থেকে যীশুর ক্রুশে আরোহণের ছবিটা কেন তোমার পছন্দ হ'লো। ছবিটার জ্যামিতিক গঠনপদ্ধতি, কিংবা কালোর প্রাধান্যই তোমার ভালো লেগেছে ব'লে মনে হয় না।'

'তা হ'লে আমরা খ্রীষ্টানই।' হেসেছিলো বিম্মি।

'আর—'

'কি আর?'

'তোমার বিয়েটা দেয়া দরকার।'

'সে সম্বন্ধেও কিছু বলেছেন নাকি?'

'তা বলেছেন। তোমাদের সে গ্রামেই একটা ভালো পাত্র আছে।'

'কি করে পাত্র?'

'আ ছি, নিজের বিয়ের কথায়—'

'তা বটে,' হাসলো বিমলা, 'চিঠিটা দাও, ভুবনবাবু, প'ড়ে নি। আলাপ না ক'রেই বুঝতে পারবো।'

'না।'

'কি যে ভাবো তুমি আমাকে। আঠারো বছর বয়স হ'লো এবার। তা ছাড়া যে মেয়ে রেঙ্গুন থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে বাংলায় আসতে পারে সে অনেকদূর যেতে পারে।'

'আঠারো বয়সের কথাই।' ভুবনবাবু বিমলার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, 'তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কও নেই।'

এক ঝলক রক্ত উঠলো কানের গোড়া অবধি। 'কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।' এই ব'লে বিমলা চেয়ার ছেড়ে ভুবনবাবুর পাশে গিয়ে বসলো, 'কিন্তু গ্রামের পক্ষে যা নতুন, এই কাচের শার্সি বসানো দুখানা ঘর তুলেছো তুমি। এগুলো একটু পুরনো না হ'লে ছেড়ে যেতে আমার ভালো লাগবে না।'

'তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিলো বিমলা। মনের একটা গোলমেলে অবস্থা। অবশেষে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলো, 'রান্না জুড়িয়ে দিয়ে আর লাভ

কি হবে? খেতে দিই। বিয়ে আর নতুন কি দেবে এনে? সংসার হু'জন মিলেই তো করছি।'

কিন্তু ওটা একটা কথার কথা। সেদিন রাত্রিতে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বিমলা ভেবেছিলো। দুজনের পার্টনারশিপে একটা সংসার চালানো আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হওয়া এক কথা নয়। তা বুঝবার বয়েস তার হয়েছিলো বৈকি। নিঃসঙ্গ শয্যায় সে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিলো।

এক রাত্রি নয়, অনেক রাত্রিই সে ভেবেছে। চিন্তার সুযোগ ছিলো। এখন যেমন তখনও তেমনি কাছে থেকে পৃথক থাকা সম্ভব ছিলো ব'লেই তা হয়তো সম্ভব হয়েছে।

অন্ধকার উঠোনের ওপারে রান্নাঘরের দাওয়ায় কুপিটাও ধোঁয়াচ্ছে। ভুবনবাবুর ঘরের আলোটা বারান্দা পর্যন্ত এসে পড়তে পারতো, কিন্তু তার বদলে ভুবনবাবুর ছায়াটাই এসে পড়েছে। রান্নাঘরে উনুনে আঁচ দিতে না গিয়ে সে বরং ভুবনবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

'বসতে দাও।'

ভুবনবাবু কাগজটা একপাশে সরিয়ে কিছুক্ষণ বিমলার মুখের দিকে তাকালো, তারপর আবার কাগজেই মন দিলো।

'শরীর কি রকম আছে?'

'তা মন্দ নয়।'

'কাগজে কি খবর?'

'সেই পুরনো খবর। দণ্ডকারণ্য।'

কাগজের পৃষ্ঠা উল্টালো ভুবনবাবু।

বিমলা বললো, 'তোমার এবার বছর তেতাল্লিশ হ'লো, ভুবনবাবু?'

'কিছু একটা হয়েছে। কেন?'

'তখনও আমাদের বয়সের বছর দশেক তফাৎ ছিলো।'

'তোমার যখন দশ বছর, আমার বয়স তোমার বয়সের দ্বিগুণ ছিলো।' রসিকতা করলো ভুবনবাবু স্কুল মাস্টারের ভাষায়।

রসিকতার পাশ কাটিয়ে ভুবনবাবু। ভুবনবাবুকে দেখে এখন প্রথমেই যা মনে হয় ডাক্তারি ভাষায় তাকে রক্তহীনতা বলে। স্বল্পাহারী, স্বল্পভাষী, অনুচ্চ একটি ব্যক্তি। এই লোকটি যে রেঙ্গুন বজ্রযোগিনীর পথে পাড়ি দিয়েছিলো তা বিশ্বাস হয় না। কিংবা এমন হ'তে পারে সেবার পাড়ি জমাতে গিয়েই

তার সারবস্তু নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। আর সারবস্তু নিঃশেষ হ'লেই মানুষ থেমে যায় না।

বিমি লক্ষ্য ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো ভুবনবাবু এক সময়ে সুপুরুষ ছিলো। এবং যদি কেউ অপক্ষপাতী দৃষ্টিতে যাচাই করে, এখনও তাকে রূপবান বলবে।

বিমলা বললো, 'আমরা অদ্ভুত ভাবে স্বাধীন হ'য়ে গেছি, ভুবনবাবু, তা কি লক্ষ্য করেছ?'

'আমার চাকরি সত্ত্বেও?'

'আরে না। ওদিকে যেয়ো না। সে স্বাধীনতা বনে জঙ্গলেও পাওয়ার পথ নেই। জঙ্গলের কুটির তোলার জায়গা, কুটির বাঁধার গোলপাতা বা বুনো ঘাস সবই সরকারের। আমি বলছি আমার এবং তোমার ব্যাপার। আমার সেই সতর্ক জ্যেঠামশাইদের আর কোন পাত্তা নেই। এই দু'জনে আছি— কারো কিছু বলার নেই।'

'হুঁ', বললো ভুবনবাবু।

'অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তোমার?'

'আলাপটা চালিয়ে যেতে চাও নাকি?' ভুবনবাবুর এটা এক অদ্ভুত ধরনের হাসি। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

'বন্ধ করলুম।'

কাগজের পৃষ্ঠা উল্টালো ভুবনবাবু।

'আজ একটু রান্না করি রাত্রিতে? রোজকার মত নয়।' বললো বিমি।

'কি হবে?'

'মুদিখানায় ধার হবে না।' বিমি হাসলো, 'মাঝে মাঝে স্বাদ বদলে নেয়া ভালো।'

'কেউ তোমাকে মুদিখানায় ধার করতেও নিষেধ করেনি, স্বাদ বদলাতেও না। তুমিই নিষেধ করেছো সন্ধ্যাবেলার ছাত্র পড়াতে।'

'সে তো অনেকদিন আগে বলেছিলুম।'

'এখন তা হ'লে আপত্তি নেই?'

বিমলা মনের মধ্যে তলিয়ে দেখলো। কি আপত্তি? মন্দ কি, নয়। কয়েকটা টাকাই আসবে। কিন্তু এখন আপত্তি নেই ভাবতে গিয়ে তখন কেন আপত্তি করেছিলো সেই যুক্তিগুলি খুঁজলো সে, মনে এলো না। তার বদলে

বরং সেই সময়ের সেই অনুভবলোকে যুক্তিহীন অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্ম সে পৌঁছে গেলো। যুক্তি থাকলে এগোনো যায়, শুধু অনুভব পাক খেতে থাকে।

বিমলা বললো, 'তখন তোমার শরীর ভালো ছিলো না।'

'তা হবে।'

তা হবে যে নয়, এটা বিমলা জানে। শুধু বোঝা গেলো এ মিথ্যাটার আবরণ ভুবনবাবুর কাছেও স্বচ্ছ।

কিন্তু সাধারণত তাই হ'য়ে থাকে। উপার্জনক্ষম পুরুষটির স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই গৃহকর্ত্রীরা এমন সব নিষেধাত্মক অনুরোধ করে। তাদের অনুকরণ?

হাতের কাছে কথা থাকে না। কথা খুঁজেই আনতে হয়। হঠাৎ যেন খুঁজবার মেজাজটাই নষ্ট হ'য়ে গেলো।

বিমলা বললো, 'ব'সে থাকলে অন্যদিনের চাইতে ভালো রান্না হবে না, যাই।'

রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে সে ভাবলো। আর যাই হ'ক, নিষেধটার মধ্যে ভুবনবাবুর স্বাস্থ্যের জন্য দুর্ভাবনা ছিলো না। কিন্তু কিছু তো ছিলো। যা ছিলো বললে সত্য' বলা হবে, সেটাই যে মিথ্যা। সে তো ভুবনবাবুর নবোঢ়া নয় যে সন্ধ্যায় বিশ্রামের ক্ষণ উপভোগ করার জন্যই ভুবনবাবুকে বাইরে না-যেতে অনুরোধ ক'রে থাকবে। কিন্তু তখন এই মিথ্যা একটা আবেগই হয়তো তার ব্যবহার থেকে বুঝে থাকবে ভুবনবাবু। কিম্বা তেমনি একটা ঝোঁক তারও এসেছিলো। কৌতুকের মতো বোধ হয়।

উনুনে আঁচ দিয়ে বেরিয়ে এলো বিমি।

মিথ্যা বলতে তাকে হচ্ছেই। পাঁচ সাত দিন আগেকার কথা। গাঙ্গুলী গিন্নীর কানে যত কথা যায়, সে বলে তার চাইতেও বেশী। আর গাঙ্গুলী গিন্নীর একার কানে যত কথা যায় পাড়ার পাঁচ কানেও তত যায় না। গাঙ্গুলী গিন্নী বলেছিলো, 'রাতে সেদিন তোমাদের বাবুর অসুখ করেছিলো।'

'তা করেছিলো।'

'এ বয়সে কাছের লোককে পাশে পেতে ইচ্ছা হয়।'

'হয় নাকি? কি জানি।' বিমি হাসলো গাঙ্গুলী গিন্নীর উপদেশ দেয়ার প্রবণতা দেখে।

গাঙ্গুলী গিন্নী মনে করলো সে তার কথার রস পেয়েছে।

বললো, 'অবশ্য মাঝে মাঝে রাগ ক'রে অন্য ঘরে শোয়া মন্দ নয়, কিন্তু কষ্ট দিতে নেই পুরুষকে।'

যতখানি সাবধান হওয়া দরকার তার চাইতে বেশি সাবধান হয়েছিলো সে। বলেছিলো, 'গত বছর প্লুরিসি হয়েছিলো। তারপর—'

'অ। ডাক্তার মানা করেছে বুঝি?'

মাথা নাড়লো বিমলা।

সাবধান হওয়ার যুক্তিটা কি মূল্যহীন? কি হ'তো যদি সে বলতো তারা বিবাহিত নয়? হ'তো কিছু। এর আগে কখনই কারো কাছে সে বলেনি, সে ভুবনবাবুর স্ত্রী। স্ত্রী নয় তাও তো বলেনি। আর মিথ্যাটা নতুনও নয়। গাঙ্গুলী গিন্নীকে যা বলেছিলো সে, সেটাতে আচরণটাকে ভাষায় প্রকাশ করার বেশী কিছু নেই। দুবছর হ'লো তারা পল্লাতে একই বাড়ীতে বাস করছে; যে ভাবে দু'জন দু'জনকে সম্বোধন করে,তাতে লোকের এই ধারণা জন্মালে তাকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

আর ধারণা জন্মাতে দেয়াতে তার কি আপত্তি ছিলো?

পুরনো অনুভবকে ঠিক আগের মতো ক'রে ফিরিয়ে আনা যায় না। সে সময়কার বর্ণনা হ'তে পারে এমন কতগুলি কথা মনে আসে। কিন্তু কথাগুলি যেন পরাগ ঝ'রে যাওয়া ন্যাড়া কদম ফুলের মতো নিরেট কিছু। অনুভবের কোমল স্পর্শও নেই, সজীবতা দূরের কথা।

সে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছুলো। কিন্তু তা রাত্রিতে। তার আগে সে আনাজ কুটে উঠে রান্নার যোগাড় ক'রে নিলো। দিনের বেলায় যেমন দু'একটা ব্যঞ্জন রান্না করে তা করলো। ভুবনবাবুকে খেতে দিয়ে লক্ষ্য করলো ভুবনবাবু অন্য রাত্রির তুলনায় তৃপ্তি ক'রেই খেলো। দুঃখের মতো কিছু একটা ভুবনবাবুর আহার পাত্রের চারিদিকে ঘোরাফেরা করলো। কি হয় যদি ভুবনবাবু আর একটু পরিশ্রম করে তৃপ্তি পায় এ বাড়িটার জন্য? কেন আর তাতে বাধা দেয়া?

অন্যান্য রাত্রির মতো অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ না করে সে চিন্তা করলো।

বন্যা হয়েছিলো। কিছুদিন থেকে সারাদিন সারারাত বৃষ্টি হচ্ছিলো। ক্যাম্পের তাঁবুর ছাদ ফুটো করে জল পড়ছিলো, বৃষ্টির তেরচা ছাটে কল্পনীয় সবদিকের কানাতের আবরণ দিয়েও জল আসছিলো তাঁবুতে। থাকে মেঝে

বলে ক্যাম্পের লোকেরা, তাঁবুগুলোর নিচে নিচে সেই স্বল্পপরিসর সিমেন্ট ঢাকা মাটি পায়ে পায়ে কাদায় প্যাচপেচে হয়ে উঠলো। ক্যাম্পে বর্ষার রূপ এটা। রাত্রি এবং দিনে বসতে শুতে ওই কাদাই গায়ে মাখতে হবে। সহ্য হ'য়ে গিয়েছিলো। যেমন সহ্য হ'য়ে গিয়েছিলো ক্যাম্পের গন্ধ। পৃথিবীর সব কিছু পচতে সুরু করলে তেমন গন্ধ আসতে পারে। রাত্রিতে ক্যাম্পের কেউ ঘুমোতে পারলো না। অসুস্থ শিশু কয়েকটিকেও বাপ মায়ের কোলে কিংবা জলে দাঁড়িয়ে কাটাতে হ'লো। দুতিন বছরের রুগ্ন কৃশ নিদ্রাবঞ্চিত শিশুরাও তাদের এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। ভোর রাতে একদল লোক উঁচু ব'লে রাজপথে গিয়ে দাঁড়ালো। তারাই পথিকৃৎ। তাদের দেখাদেখি গোটা ক্যাম্পটাই সড়কের উচ্চতাকে আশ্রয় করলো। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারলো বন্যা হয়েছে। তাদের ক্যাম্পের অত বড় মাঠটা ডুবে আছে জলে।

কি ক'রে ব্যাপারগুলো সম্ভব হ'লো তা সে জানে না। উদ্বাস্তুরা জানতো সড়কটা ধ'রে সোজাসুজি চলতে থাকলে কোথাও না কোথাও পৌঁছানো যায়। বুদ্ধিটা তারা নিজেদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলো। সার বেঁধে উদ্বাস্তুরা চলতে লাগলো। স্কুলের কাছে পৌঁছুলে বন্ধ ফটকটার কাছে তারা কিছুক্ষণের জন্য দ্বিধা করেছিলো। তারপর এক দুই ক'রে তারের বেড়া ফাঁক ক'রে গলিয়ে স্কুল বাড়িটার ঘরে গিয়ে উঠতে লাগলো। দারোয়ান প্রথমে হাঁ-হাঁ ক'রে অধিকার ও ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করেছিলো কিন্তু জনতার ঘূর্ণ্যমান আবর্তে মিশে গিয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার ভয়েই সম্ভবত সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো।

সাতদিন ছিল উদ্বাস্তুরা সেই স্কুলের বাড়িতে, বন্যা নেমে যাওয়ার পরেও চারদিন। স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হ'য়েই স্কুল বন্ধ রেখেছিলো। আর স্থানীয় মাড়বারী ত্রাণ সমিতি একটা লঙ্গরখানা খুলেছিলো স্কুলের প্রাঙ্গণে। দিনের বেলায় ডাল তরকারি ভাতের একটা মহোৎসব হ'তো। সন্ধ্যা হ'তেই বড় বড় বালতি হাতে ওদের লোকরা ঘরে ঘরে ঘুরতো। বালতিতে গরম পাতলা খিচুড়ি, চালের খুদে তৈরী। যার যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে যাবে। এ নিয়ে অনেক কৌতুকের ব্যাপার হয়েছিলো। দুপুর বেলায় নিছক ভাত তরকারির মচ্ছোবে তাদের অনেকেরই এমন আকণ্ঠ খাওয়া হয়েছে যে অনাহারে অল্পাহারে অভ্যস্ত তাদের শুকিয়ে যাওয়া পাকস্থলীতে রাত্রির

খিচুড়ির স্থান ছিলো না। কিন্তু হাতের লক্ষ্মী ঠেলবার ভয় ছিলো। কালি-পড়া কড়াই, তাওয়া, গেলাস, থালা বার ক'রে ক'রে সকলেই তারা খিচুড়ি নিলো। বিমি নেয়নি। তার এই না-নেয়ার ব্যাপারটাই একটা আলাপের সূত্রপাত করেছিলো। আর এই আলাপ যেন ক্লাশ এইটের ঘরখানিকে একটা সমাজবদ্ধ শালীনতার দিকে এগিয়ে দিলো। দরজার চৌকাঠে ইংরেজিতে ক্লাশ এইটই লেখা ছিলো?

ক্লাশ এইটের ঘরখানি স্কুলের অন্যান্য ঘরের চাইতে বড় ছিলো কিনা সে খবর তারা রাখে না। সেই ঘরে তারা ছ-টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলো। পাঁচ সাতটি শিশু, আট-ন-টি স্ত্রীলোক এবং অনুরূপ সংখ্যক পুরুষ।

মরণচাঁদ একটা ভাঙা কাঠের তোরঙ্গের উপরে ব'সে থেলো হুঁকোয় তামাক টানছিলো। খিচুড়ির ব্যাপারে তার আগ্রহ দেখানোর কিছু নেই। সে ভার বউ সোদামুনির। বালতি ধরা জোয়ানরা চ'লে গেলে মরণচাঁদ অনেকটা সময় ইতিউতি ক'রে, হঠাৎ ব'লে বসলো, 'আপনে নিলেন না।'

কথাটা যে তাকে লক্ষ্য ক'রেই বলা হয়েছে তা বুঝতে পারেনি বিমলা।

জেলেবউ বললো, 'কাকে কও, উনাকে নাকি?'

বিমি লক্ষ্য করেছিলো ঘরের লোকগুলির দৃষ্টি জেলেবউ এর কথাকে অনুসরণ ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে। বিব্রত হ'য়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলো সে।

কিন্তু বিব্রত হওয়াটা অযৌক্তিক। অনেকদিন কেটেছে তার এদের সঙ্গে।

সে বললো, 'খিদে নেই।'

তারপর তাদের আলাপটা গড়িয়ে গেলো খিচুড়ির দিকে। কবে কোথায় কে কিরূপ খিচুড়ি আস্বাদ করেছে। পুরুষদেরই আলাপ, মেয়েরাও যোগ দিলো। পুরুষরা বড়ো বড়ো নিমন্ত্রণের আলাপ করলো আর মেয়েরা কোন রান্নায় কি ফোড়ন দিতে হয়। এমন সময়ে মরণচাঁদ তার হুঁকো নামিয়ে রেখে বললো, 'আমাকে সকলে মাথাপিছু দুই দুই পয়সা যতি দাও—'

'কি তাহলি?'

'ভাজা কিনে আনে দিব। খিচুড়ির সোয়াদ হবি।'

পয়সা নিয়ে মরণচাঁদ বাজার থেকে পিঁয়াজ-বড়া কিনে এনেছিলো। পয়সা সকলে দেয়নি এবং এও স্মরণীয় যে মরণচাঁদের কাছে দুটি আনা দুটি মোহরের মতো মূল্যবান। তা সত্ত্বে-ও সে যা এনেছিলো পরিবেষণের সময়ে সকলকেই সমান ক'রে দিলো। অদ্ভুত উদার ভঙ্গি মরণচাঁদের। আর তার ঔদার্যই

যেন একটা পূর্ণতার আবহাওয়া এনে দিলো। খিচুড়ি খাওয়ার সে কি আনন্দ।

মরণচাঁদ যেন তার পুরনো জীবনকে সার্থকভাবে স্পর্শ করেছে তার মনের দিক দিয়ে। হঠাৎ সে বলেছিলো বিমিকে, 'মা ঠাকরুণ। আপনের খাওয়া হ'লো না।' যেন মরণচাঁদ প্রাক্তন পল্লীজীবনের ন্যায়-অন্যায় বোধকেও ফিরে পেয়েছে।

আর সে ফিরে পাওয়া যেন একটা নেশার মতো। রাত্রিতে ঘুমানোর আগে। আহা, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চার দেয়াল, এমন মেঝে, বৃষ্টি-নিরোধক এমন ছাদের আবরণ কত যুগ তারা পায়নি। মরণচাঁদ বললো, 'ভাই সব, কথা কই, একখান। মেয়ে ছাওয়ালরা ঘরে শ'ক আর ছোট ছাওয়ালরা। আর আমরা পুরুষরা এই বারান্দায়।'

সকলেই থ' হ'য়ে গিয়েছিলো। অবাক হওয়ার মতো কথা। এ ঘরের পরিসরে ছটি পরিবারের থাকা সাধারণের হিসাবে সহজসাধ্য নয়, কিন্তু ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা তাতো পারেই, বরং আনন্দের সঙ্গে পারে। হাত পা ছড়ানোর জায়গাই পেয়েছে তারা। মরণচাঁদের কথায় দ্বিধা করতে লাগলো সকলেই। যেন বহুদিন ভুলে যাওয়া কথা কেউ মনে করে দিয়েছে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে একটি যুবক বিছানা পাতছিলো। বিছানায় যেন তার একটা আকর্ষণ আছে। তার বউ রাস্তার কলে থালা বাটি ধুতে গিয়েছে। মরণচাঁদের কথায় অন্য পুরুষরা দ্বিধা করছিলো, কিন্তু যুবকটি এক রোখার মতো তার চটের বিছানা টানটোন করছিলো। মরণচাঁদ তাকে হাত ধরে টেনে তুললো। বললো, 'বাইরে আসো।'

সে রাত্রিতে এবং তার পরের কয়েক রাত্রি পুরুষরা বাইরে শুয়েছিলো।

কথাটা বোধ হয় শালীনতাবোধ। ভাষাটা ওদের জানার কথা নয়। বহুদিন পরে বিমির মনে পড়েছিলো মরণচাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে।

বিমি নিজের মাদুরের বিছানাটা বিছিয়ে নিয়েছিলো। বহুদিন পরে কতগুলি পরিচিত গুঞ্জনের বদলে অন্য কতগুলি পরিচিত স্বর সে শুনতে পেলো। ছেলেমেয়েরা দু-একবার কান্নাকাটি করলো। কিন্তু ক্যাম্পের সেই প্রকাশ্য চাপা গলার প্রেম নিবেদনের কুৎসিত কামাতুরতা কারো নিদ্রাকে বিঘ্নিত করলো না। দরজার কাছে মরণচাঁদ নিজে শুয়েছিলো। সে বললো, হয়তো তার বাবার কাছে শিখে থাকবে, প্রয়োজনের সময়ে সে শিক্ষা

কাজও দিচ্ছে ; বললো—'হরি, হরি।' 'তা বিনে আর কি?' ওদিক থেকে আর একটি পুরুষের কণ্ঠ সাড়া দিলো। চার দেয়ালের সাদা চুনকাম করা পরিচ্ছন্নতা যেন মরণচাঁদকে নেশার মতো ধরেছে।

বহুদিন পরে বিমলা বড়ো ভাল ঘুমিয়েছিলো। মানুষের ঘুম। চার দেয়ালের বাইরে আশঙ্কাকে নির্বাসিত রেখে ঘুম। জন্তুর মতো রাত্রির অন্ধকারে আত্মসমর্পণ ক'রে এক কান সজাগ রেখে বিশ্রাম নেয়া নয়।

রাত্রির অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করাই বলা উচিত। তাও বোধ হয় কম বলাই হ'লো। এখনও সে অনুভবটা কোন কোন রাত্রিতে স্নায়ু-গুলিকে একটা প্রতিরোধ তৈরি করার মতো টনটনে ক'রে রাখে। তেমনি যেন মস্তিষ্ক সজাগ হ'য়ে থাকে ঘুমের মধ্যেও। এখন আর প্রয়োজন নেই। পাশের ঘরেই ভুবনবাবু। তা সত্ত্বেও অভ্যাসবশেই যেন কোন কোনদিন ঘুমোতে যাওয়াকে রাত্রির অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ ব'লে মনে হয়। মনে হয় অন্ধকারের পাতলা আবরণ ছাড়া আর কোন আড়াল আছে বিপদ থেকে?

বিষয়গুলি ঠিক পরে পরে মনে আসে না। এলোমেলো হ'য়ে যাওয়া চিন্তা।

হ্যাঁ, মরণচাঁদরা ফিরে গিয়েছিলো ক্যাম্পে। তাদের সেই শালীনতা-বোধ? ক্যাম্পে ফিরে তা বোধ হয় আবার অনেকদিনের জন্যই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যাম্প তো চুনকাম করা স্কুল ঘরের দেয়াল নয় যে মনের ভিতরে তার শুভ্রতার ছায়া পড়বে।

কিন্তু বিমি আর ফিরে যায়নি ক্যাম্পে। ভুবনবাবু এসেছিলো।

আশ্চর্য সে আসা। বিমলাকে খুঁজে পাওয়া আশ্চর্য নয়। কারণ সে-ই চিঠি দিয়েছিলো। ঠিকানা দিয়েছিলো চিঠিতে। হলুদমোহন ক্যাম্প, গ্রুপ নম্বর ছয়, তাঁবু নম্বর সাতাশ, কার্ড নম্বর পাঁচশ' সাতাশি। আশ্চর্য বোধ হয়, ভেবে দেখতে গেলে, এতদিন পরেও ভুবনবাবুর সাড়া দেয়া। এ ভাবনাটা অবশ্য পরের, আশ্চর্য হওয়াটাও পরের। তখন নির্বাক হয়েছিলো সে, কি করবে ভেবে পায়নি, কাঁদতে গিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে ফেলেছিলো। কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! ভুবনবাবুর গায়ে ধোবা-বাড়িতে ধোয়া, ইস্ত্রি করা ধবধবে পাঞ্জাবি। পরিচ্ছন্ন ক'রে তার দাড়ি কামানো। কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! মৃদু একটা প্রসাধনের-সৌরভও ভুবনবাবুর গায়ে। ভুবনবাবুর হাতে ছোট একটা ব্যাগ, তেমনি ছোট একটা বিছানা। আশ্চর্য, একই জাতের মানুষ সে আর ভুবনবাবু এই অনুভূতি।

হাত ধ'রে ভুবনবাবুকে টেনে নিয়ে স্কুলের বারান্দায় ছুটতে ছুটতে উঠে গিয়েছিলো সে। নিজেকে এবং তাকে সামলানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি ভুবনবাবু। সম্বিৎ পেলো সে দরজার কাছে ক্লাস এইটের ঘরে ঢুকতে গিয়ে। থেমে দাঁড়ালো। পাথর হ'য়ে গেলো। আর মরণচাঁদ অতি সুবিন্যস্ত বেশভূষায় এই বাবুটিকে, তার হাত ধ'রে দাঁড়ানো বিমলাকে দেখে মাথা নাড়তে লাগলো। মরণচাঁদ করবার মতো একটা কাজ পেয়েছিলো। রাস্তার ধারে নামানো ছিলো ভুবনবাবুর ব্যাগ আর বিছানা। কুড়িয়ে নিয়ে ভুবনবাবুর কাছে এনে রাখলো মরণচাঁদ।

মরণচাঁদ যেন ক্লাস এইট বাড়ির কর্তা, মেয়ে-জামাই যেন তার সামনে। কিংবা এ উপমায় কি বাহুল্য আছে? এটাও কি মরণচাঁদের পূর্ব অভ্যাস ফিরে পাওয়ার নজির হিসাবে নেয়া যাবে? গ্রামের জীবনে বাবুদের মালপত্র তার গহনার নৌকা থেকে এমন করে নামিয়ে দিতো নাকি?

কিংবা দুটি দিকই বোধ হয় অংশত সত্য। বাড়ির কর্তার মতোই আকস্মিক নিরানন্দে গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলো সে হঠাৎ পাওয়া সুখের মধ্যে। সেদিন রাত্রেই সে দরজার পাশে বিছানো বিছানা থেকে গল্প করছে এমন মেয়েদের গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিয়েছিলো—চুপ থাক। কারণ সে দেখতে পেয়েছিলো বিমি বিছানা না বিছিয়ে দেয়ালের গায়ে কালো ছায়া ফেলে গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে।

কারণ ভুবনবাবু যেমন আকস্মিক ভাবে এসেছিলো তেমনি আকস্মিক ভাবেই চ'লে গিয়েছিলো। ক্লাস এইটের ঘরের মধ্যে একবার নজর দিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিলো সে। আর যাবার সময়ে চিরকালের মতো চ'লে যাবার ভঙ্গিতে তার ব্যাগ ও বিছানা নিয়ে গিয়েছিলো।

সে রাত্রিটা ঠায় ব'সে কাটাতে কাটাতে কি ভেবেছিলো বিমি?

পাশ ফিরলো বিমলা। কাঁথাটা গায়ে টেনে দিলো। শীত শীত করছে। পারা গেলো তো লেপ না বানিয়ে এ শীতটাও চালাতে। ভুবনবাবু রাগই করেছিলো এ বছরের শীতের গোড়ায় সে আপত্তি করাতে। কিন্তু তার নিজের জন্য লেপ বানানোর বদলে ভুবনবাবুর একটা চাদর হয়েছে। ভুবনবাবু যে ভাবে স্কুলের সাময়িক ক্যাম্পে এসেছিলো এখন তার তুলনায় বেশভূষায় অনেক দরিদ্র।

কি ভেবেছিলো? ভুবনবাবুর চলে যাওয়াটা নয়। অবাক হওয়ার ভাবটাই

তখন তার কাটেনি। তিন চারদিনই বোধ হয় তার মনের এই অবস্থাটা ছিলো। যে সব দিক দিয়েই অবলুপ্ত হঠাৎ সেই যেন ফিরে এসেছে। আর তার চাইতেও যা অসম্ভব যেন কালের স্রোতকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে, সেই পুরনো দিনে তার দিন আবার অবতরণ করবে। সেই ভুবনবাবু!

রাত্রি শেষে দিন এসেছিলো। কি করবে সে? গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকা ততক্ষণে সেই ঘরের অন্য লোকদেরও বিব্রত করছে। মাড়বারী ত্রাণ সমিতির দান তখন আর অবাক করার মতো নতুন নয়। ইতিমধ্যে তার ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে আলাপ করছে তারা। কিন্তু সেই আলাপের ফাঁকে ফাঁকে তারা এক একবার থেমে গিয়ে দেখছে তাকে।

উঠে গিয়ে পথের ধারে কলতলায় সে স্নান করেছিলো। তা ক'রে নিদ্রা-হীন রাত্রির রুক্ষতাটা গেলো। চিন্তা কিছুই পরিচ্ছন্ন হ'লো না।

পায়ে পায়ে চ'লে পথে বেরিয়ে পড়েছিলো সে। ভুবনবাবু আসবার পর থেকে তার আহার হয়নি, রাত্রিতে সে ঘুমোয়নি। এসব কিছুই মনে পড়লো না তার। আবার পথ।

হলুদমোহন ক্যাম্পের পাশে এই শহর। পুবমুখা একটা রাস্তা তার সম্মুখে। চলতে গিয়ে মুখে আলো এসে পড়ছে। দু'পাশের বাড়িগুলোর ঘুমের জড়তা তখনও ভালো ক'রে কাটেনি। তার যেন পূর্বনির্ধারিত একটা গন্তব্য আছে এমন ক'রে সে পথ চলছে। একটা খেলাও যেন চলেছে তার মনে মনে। এক নিরাপদ যান্ত্রিক খেলাই যেন। এক নির্বোধ যেন বন্ধ গলির এমাথা-ওমাথা করছে কাউকে ছুঁতে চেষ্টা ক'রে ক'রে। পথ একটা বাঁক নিয়েছিলো। সূর্যের আলোটা মুখে না প'ড়ে বাঁ কাঁধের দিকে লাগছিলো। দিক পরিবর্তন করা দরকার এরকম একটা অনুভব হ'লো। তারপর আবার সে হেঁটে চললো।

শহরের শেষে নদী। দুপুরের কিছু আগে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বিমলা। রোদ লেগে নদী তীরের বালি ঝকঝক করছে। নদী তরঙ্গগুলি স্ফটিকের মতো। আলো চমকাচ্ছে মাছরাঙার ডানায়। খেয়া নৌকা এপার ওপার করছে। কিন্তু এ সবই তার মনকে স্পর্শ ক'রে পিছলে পিছলে স'রে গেলো। এক রুদ্ধনিশ্বাস আকুতি যেন—খেয়া, খেয়া খেয়া।

শূন্যতা আর শূন্যতা। অনেক ঘুরেছিলো সে সেদিন। কোথায় যেতে পারতো সে?

দুপুর যখন পার হচ্ছে, সে তখনও দু'পায়ের উপরে। একবার সে আবিষ্কার করলো সে কাপড়ের দোকানগুলির মধ্যে এসে পড়েছে। দু'দিকে অনেক দোকান—তাদের বেশীর ভাগই কাপড়ের। কাপড়, কত অজস্র, কত রকমের শাড়িই যে ব্যবহার হয়। দোকানের শো কেসে সাজানো, দোকানের আলমারিতে গোছানো। অবাক, অবাক, এত কাপড়। এমন শুভ্র, এমন শুচি, এমন মনোহরণ। অন্য পথ ধরলো সে। ঘুরে ঘুরে আবার সেই কাপড়ের দোকানের সামনেই সে এসে পড়লো। সে কি তবে ইচ্ছা ক'রেই আবার ঘুরে এলো? কিংবা কাপড়গুলিই তাকে ঘুরিয়ে আনলো! দূরে যেতে দিচ্ছে না? ভুবনবাবুর পরিচ্ছন্ন বেশভূষার সঙ্গে এই ঘুরে ঘুরে মরার কি যোগ ছিলো? সে সময়ের অনুভব এখন আর বোঝা যাবে না।

বাজারটা পার হওয়ার আগেই গানের শব্দ কানে এলো। তাকিয়ে দেখলো সে পথের ধারে গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে একজন গান করছে। আর একটি মেয়ে নাচছে। দূর থেকে মনে হয়েছিলো তারা হয়তো বা বন্যার্ত্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করছে। কারণ যে ধরনের নাচ গান হচ্ছিলো তার উৎসারিত আনন্দ চিনবার মতো প্রস্তুতি ছিলো না তার মনের।

বিমলা অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেললো। কালো তো একটা রঙ, অন্ধকারের কোন রঙই নেই। তার মনে হ'লো তার ঘরের অন্ধকারটা কাঁপছে। অন্ধকার, না সময়?

ডান পাটা রাস্তার উপর দিয়ে চ'লে চ'লে সেটাকে চেপে ধরলো। পা-খানা যেন জীবন্ত কোন সত্তা।

তার আগে যা ঘটেছিলো তা বোধ হয় এই, বিমলা মনে করতে লাগলো। গাইয়েদের চারিদিকে ক্রমশই ভীড় জমছিলো। আর সেই ভীড়ের এক-পাশে সে দাঁড়িয়েছিলো। সে ভাবলো মেয়েদের নতুন ধরণের পোষাক পুরুষদের আকর্ষণ করে। নাচুনে মেয়েটির ফিনফিনে রঙীন মখমলের পাঞ্জাবির দিকে পুরুষরা চেয়েছিলো। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁপে কেঁপে, কখনও দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিলো। পথের ধারে রুমালের মতো কিংবা কিছু বড়ো কাপড়ের টুকরো পাতা ছিলো, তার উপরে আনি দুয়ানি পয়সা মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো পথচারী শ্রোতারা। একটা সিকি গড়িয়ে এলো রুমালটায় না প'ড়ে। গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে এলো বিমলার পায়ের দিকে আর তখন তার ডান পাটা চ'লে চ'লে সেটার উপরে গিয়ে থেমে গেলো। আর তার দৃষ্টিটা

তখন গিয়ে পড়েছিলো নাচুনে মেয়েটার মুখের উপরে। এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছিলো সে। মেয়েটার মুখে বসন্তের দাগ। আর তার নিজের বুকও বোধ হয় থরথর ক'রে কাঁপছিলো। চোখ দুটি টলমল করছিলো। সোনার তারের মতো তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছিলো নাকি?

সিকিটা যেন গেঁথে দিয়েছিলো তাকে পথের কাঁকর ধুলোর একটা আস্তরণের সঙ্গে। নাচুনেরা চ'লে গিয়েছিলো হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে। তারপরেও দীর্ঘ-সুদীর্ঘ এক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়েছিলো। ভয়?

জাল নাকি? জাল হওয়াই স্বাভাবিক। জাল না হ'লে কেউ নাচওয়ালা ভিখারীকে একটা সিকি ছুঁড়ে দেয়। জালই হবে। মুঠো ক'রে চেপে ধরা সিকিটা হাতের গরমে ঘেমে উঠেছে। কিন্তু মুঠো করে চেপে ধরলেই কি জাল আসল বোঝা যায়?

সে যাই হ'ক, তার কি দরকার ছিলো, কি যুক্তি ছিলো সিকিটাকে ওভাবে আত্মসাৎ করার?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো তার। অনেক কাজ। অনেক কাজই সে ক'রে যায় যার যুক্তি নেই। যেমন মিথ্যা বলেছে গাঙ্গুলীগিন্নিকে। এটাও তেমনি একটা আচরণ।

আর ফুল কিনেছিলো সে সিকিটা দিয়ে। রজনীগন্ধা কিনে সে ফিরে গিয়েছিলো স্কুলের দিকে। নিস্পৃহ হাতের মুঠি থেকে কয়েকটা ফুলের ডাঁট খ'সেও পড়েছিলো পথে। না ফিরে কি উপায়?

এতদূরে আসার ইচ্ছা ছিলো না। কি একটা বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে কতদূর চ'লে এলো সে। এরপরে ঘুম হ'লে হয়। বিমলা আবার পাশ ফিরলো।

লোভ ঠিক নয়। একটা অস্ফুট প্রবল পাওয়ার ইচ্ছা তার মোহগ্রস্ত মনের উপরে তরঙ্গের মতো ওঠাপড়া করছিলো না কি? ভুবনবাবু এসেছে। কি অবাক করা ব্যাপার! যেমন অবাক করা তার চেহারা ও সাজসজ্জা। তেমনি পার্থক্য তা সবের তার সে কালের 'অবস্থার সঙ্গে'। পার্থক্যটাই অবাক করার মতো। এটাই মোহ। আসল কথা সেদিন কি হয়েছিলো তা পরে আর কখনই সে বুঝতে পারেনি।

অবাক হওয়ার কিই বা ছিলো, ভাবলো বিমলা। ভুবনবাবু তো কোন দিন ক্যাম্পে বাস করেনি। কিন্তু তখন অবাক লাগেনি বললে মিথ্যা বলা হবে।

বারান্দায় উঠে দাঁড়াতেই মরণচাঁদ একপাশে স'রে দাঁড়িয়েছিলো। আর সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পেয়েছিলো বিমি বারান্দার এককোণে বেডিং রেখে তার উপরে মাথা হেঁট করে ব'সে আছে ভুবনবাবু। অপরিসীম ক্লান্তিতে ভুবনবাবুর পিঠটাও যেন বেঁকে গেছে। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। সন্ধ্যা ব'লেই সম্ভবত তাতে পথের ধুলো দেখা গেলো না।

'ভাড়াটে বাসা কোথাও পেলাম না, বিমল।'

'তা কি পাওয়া যায়?'

'কাল রাত্রিতে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ছিলাম।'

'ও।'

'হোটেল দু'একটি আছে। তাতে দু'জনে শুধু থাকা যায় এরকম ঘর নেই।'

স্কুলের একটা ঘর কেউ দখল করেনি। ঘরটা দেখলে তালা-দেওয়া ব'লে ভুল হয়। এই বোধ হয়, কারণ। কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে ঘরটা খুঁজে বার করেছিলো সে। আর সেই ঘরে ভুবনবাবুর বিছানা পেতে দিয়েছিলো। যত্ন ক'রে বিছানা পাতার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো যেন সেটা অনেকদিনের পরিচিত শোবার ঘর।

অনেক রাত্রিতে নয়, প্রথম রাত্রিতেই যখন সে ঘরে এলো বিমলা, তখন বিছানার উপরে ভুবনবাবু ব'সে আছে। হাঁটুর উপরে চিবুক রেখে সে-ও যেন সেই তারার আলোর মতো অন্ধকারে অবাক হ'য়ে গেছে।

রজনীগন্ধার ফুলের গোছাটা স্কুলের বারান্দায় রেলিং-এ ভর রেখে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে করতে একটি একটি ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলো সে।

ঘরে ঢুকে বললো, 'ভুবনবাবু, তোমার একখানা ধুতি দাও।'

বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজের ছেঁড়া ব্লাউজ ও ময়লা শাড়িটা ফেলে দিয়ে ভুবনবাবুর ধুতি গায়ে জড়িয়ে সে যখন ঘরের অন্ধকারে ফিরে গেলো তখন তার হাত পা কাঁপছে।

তা হ'লে ব্যাপারটা এ পল্লীতে এসেই হয়নি, গাঙ্গুলীগিন্নীর রসিকতার উত্তর দিতে গিয়েও নয়। ক্লাস এইটের ঘরের উদ্বাস্তুদের চোখের সামনে সে রাত্রিতেই মিথ্যা এই ঘোষণা করেছিলো—সে ভুবনবাবুর স্ত্রী।

মিথ্যা? মনের দিক দিয়ে? অন্তত সে রাত্রিতে? না কি, সে শুধু কৃতজ্ঞতা? কথাটাকে নাড়াচাড়া করলো বিমলা মনে মনে।

কথাটাকে সে-ই বোধ হয় আবিষ্কার করেছে এই পৃথিবীতে। রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণ। সেদিন রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণের কথা মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছিলো সেই অব্যক্ত আকুল প্রার্থনা ক'রে অন্ধকারের গহ্বরে ঢুকবার দরকার নেই।

ভুবনবাবু এতক্ষণে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে রাত্রিতে কিন্তু খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বোধ হয় সারাদিন হাঁটাহাঁটি করার ফলেই।

বেশ তো, লোকে জানুক না সে ভুবনবাবুর স্ত্রী। স্বামী স্ত্রীর মতোই দু'জনে মিলে তারা এই সংসারে চালাচ্ছে। অনেকদিন আগে এ কথাটাকে বিশ্লেষণ ক'রে চিন্তা করতে গিয়ে সে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিলো। এখন তা হ'লো না। সেটাও নির্বাক সংবেদনহীন অতীত। ভুবনবাবুর সত্যি-কারের স্ত্রী হ'তে সে পারবে না। একটি স্বল্পোচ্চারিত দৃঢ় না ছাড়া কিছুই বলার নেই তার এবিষয়ে।

শীতল এই 'না' টা বলতে গিয়ে মনে মনে তার গরম লেগে উঠলো যেন। কাঁথাটাকে কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিলো সে।

নিজের কথাই ভাবে সে, ভুবনবাবুর কথাও ভাবা উচিত এরকম একটা অনুযোগ তার মনে উঠে পড়লো। সেই এসেছিলো ভুবনবাবু। তারপরে আর ফিরে যায়নি। কখনও মনে হয়েছে ভুবনবাবুর শান্ত শীতল ভঙ্গি দেখে, সে যেন অপেক্ষা ক'রে আছে। একদিন বিমির মতি হবে আর সেদিন তাকে নিয়ে ফিরে যাবে অন্য জীবনটাতে।

কিন্তু ভুবনবাবু বিমলা ব'লে যাকে প্রতিমুহূর্তে মেনে নিচ্ছে সে তো একটা কাল্পনিক কিছু।

এই সৎসাহসী চিন্তাটার মুখোমুখি হ'য়ে সে যেন চিন্তার সাহসকেই হারিয়ে ফেললো। ধরা প'ড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিয়ে তোমাদের যা ইচ্ছে হয় বলো এরকম বলার মতো মনোভঙ্গি হ'লো তার।

কিন্তু কথাটা ভুবনবাবুর কাছেই শোনা।

বজ্রযোগিনীতে একটা আধুনিক আবহাওয়া নিজেদের জন্য তৈরি ক'রে নিয়েছিলো তারা। বাড়িটা তৈরি করার সময়ে ধনীদের অনুকরণে মধ্যবিত্তরা যা করে তেমন কোন বনেদিআনার চেষ্টা করেনি ভুবনবাবু। বরং কংক্রিটের ক্যাটালগে যেসব বাড়ির ছবি ছাপা থাকে তেমনি একটা চার কামরার ছোট

একতলা বাড়ি উঠেছিলো মাটির পথের ধারে। ঘাসে ঢাকা একটা লন ছিলো। জানালাগুলোর কোন কোনটায় কাচের শার্সি বসানো হয়েছিলো। ভিতরের দিকের বারান্দার টবে ফুলগাছ ছিলো কয়েকটি। আর উঠোনে এঘর থেকে ওঘর যেতে গেলে নজরে পড়ে এমন জায়গায় রজনীগন্ধার চাষ ছিলো। অচল-সিকি দিয়ে দোকান থেকে যে রকম কিনেছিলো একদিন সে তেমন শুকিয়ে ওঠা কিছু নয়। চা ভিজিয়ে দিয়ে যে অবসর পাওয়া যায় তার মধ্যেই কাঁচি হাতে উঠোনে নেমে একগোছা রজনীগন্ধা কেটে এনে চা-টেবিলের ভাসে সাজিয়ে দিতে পারতো সে।

তেমনি এক চায়ের টেবিলে ব'সে ভুবনবাবু বলেছিলো, 'যা দেখছ মনে কর তুমি তাই কি সত্যি?'

স্বভাবতই বিমলা অবিশ্বাস করেছিলো ভুবনবাবুর বক্তব্যে।

'এই কাঁচিটাকে দেখে মনে করতে পারো এটা রজনীগন্ধা? কিংবা এই রজনীগন্ধা দেখে মনে করতে পারো এটা-ই বিমলার আঙুল?' বলেছিলো বিমলা।

রজনীগন্ধা! কেন যে এমন সব ভুল ক'রে বসে সে কখনও কখনও?

আলাপটা তারা অনেকক্ষণ চালিয়ে গিয়েছিলো। ভুবনবাবু সেই পুরনো তত্ত্ব নতুন ভাষায় প্রকাশ করেছিলো। যার ফলে সাময়িকভাবে বিমলার এরকম একটা ধারণা হয়েছিলো, সত্যটা একাধিক হ'তে পারে একই বিষয়ে।

মানুষ যদি সত্য ব'লে না বুঝতো তার দৈনন্দিন জীবনকে তবে সে কি হাতখানাও নড়াতে পারতো মুখে ভাত তুলে দিতে। সত্য বটে কিন্তু কিসের যেন অন্তরাল আছে, আর তার আড়ালে একটা সত্য নিদ্রিত থেকে গেলো। নিজের মনে এনে তাকে প্রাণবান করা হ'লো না। নিজের মনের দিকে চেয়ে চেয়ে বিস্ময় বোধ করে বিমলা। কুয়াশায় ঢাকা একটা জলস্রোতের কাছে গেলে যেমন হয়। ঘটনাগুলোর কোলাহল কানে আসে। স্বরূপটা চোখে পড়ে না। এ যেন ভুবনবাবুর সেই জটিল তত্ত্বের সমান্তরাল কিছু।

॥ দুই ॥

'আচ্ছা, ভুবনবাবু—'

'বসো।'

ভুবনবাবু উঠে দাঁড়ালো, যেন বিমলার বসবার জন্য আসনটা টেনে দেবে।

'বসছি', ব'লে ভুবনবাবুর বিছানার উপরেই সে বসলো, 'কিন্তু তুমি আজ এড়িয়ে যাবে না।'

'যাব না, বলো।'

'আমি দণ্ডকারণ্যের কথাই বলছি। গাঙ্গুলীমশাইএর মেয়ে মালতী আসবে কিছুক্ষণ পরেই। একটা শোভাযাত্রা বার করছে তারা। খুব বলেছে যেতে।'

'যাবে নাকি?'

'গিয়ে কারো উপকার হবে?'

ভুবনবাবু ভাবতে লাগলেন।

বিমলা বললো, 'খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। প'ড়েও সন্দেহই বাড়ে। ভালো যা তা বোঝাতে এত বিবৃতি দিতে হয় কেন? এত শোভা-যাত্রাই বা কেন করতে হয় ভালো নয় বোঝাতে।'

ভুবনবাবু বললো 'মালতী কি বলে?'

'মেয়েটা সোজাসুজি বলে, ওরা চলে গেলে নাকি মালতীর দলের লোক ক'মে যাবে।

'দল?'

'নেই, হবে বলেছে। বাংলা দেশে থাকলে ওরা এই বিড়ম্বনা ভুলতে পারবে না। নিচু তলাতে অসন্তোষ নিয়ে থাকবে। তার ফলে মালতীর দলের বৃদ্ধি হবে।'

ভুবনবাবু হেসে বললো, 'মেয়েটা একটা কথা ঠিক বলেছে এখানে থাকলে বাকি জীবনটা অসন্তোষ নিয়ে কাটাতে হবে। শান্তি আসবে না।'

ভুবনবাবু ভাবতে লাগলো, মিটমিট ক'রে হেসেও চললো।

বললো, 'মালতীর দৃষ্টি বড়ো স্বচ্ছ। চোখে মোটে পর্দা নেই। দলের ব্যাপার আর মানুষের মধ্যে কোন সহানুভূতির সমবেদনার পর্দা রাখেনি।

মালতীর চেহারাটা ফুটলো বিমলার মনে। কালো রং, প্রকাণ্ড চেহারা, চোখ দুটি ছোট, নাকটার ডগা উলটানো, সামনের বড়ো বড়ো দাঁত কটিকে পুরু ঠোঁট দু'খানা ঢাকতে পারে না।

অত্যন্ত কর্মঠ মেয়ে, পাঁচজনের কাজ একা করতে পারে। বাড়িতে অত কাজ নেই ব'লে পাড়ার এ বাড়িতে ও বাড়িতে কাজ ক'রে বেড়ায়। সে চাল ঝাড়া হ'ক, কিংবা রান্না ক'রে দেয়া। এরই মধ্যে সময় ক'রে সে দলের কাজ-ও ক'রে আসে, শহরে গিয়ে। তার বিয়ের কথা ভাবা-ও যায় না। সময় কোথায়?

বিমলা বললো, 'কিন্তু আমরা দুজনেই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম।'

'ভালোই হয়েছে তা ক'রে।'

'আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয়, জানো, আমরা পৃথিবীর কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাজনীতির সুতো টানছে কেউ আর আমরা হাত পা ছুঁড়ছি। ভাবছি সেটাই বাঁচা।' বললো বিমলা।

'মালতীর খোলামেলা কথা আমাদের মুখ-ও আলগা ক'রে দিয়েছে দেখছি। ভাগ্যে কেউ শুনছে না।'

'শুনলে অবশ্যই বোকার হদ্দ বলতো।' ব'লে বিমি হাসলো।

রাজনীতির কথা তার অনেক সময়েই মনে পড়ে। অন্তত ধর্মের চাইতে বেশী। আর অনেক সময়েই ভুবনবাবু থাকে না। রাজনীতির একটা সক্রিয় সত্তা আছে? একদিন তার অনুভব হয়েছিলো সম্মুখের ওই কালো পথটাই যেন রাজনীতির প্রতিমা-অর্পিত রূপ। সরীসৃপ যেন রাজনীতি। কুণ্ডলীতে আবদ্ধ ওই হলুদমোহন ক্যাম্প। বিশ্রাম শেষ হ'লেই আবার গ্রাস করা সুরু হবে।

ভুবনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে ঘরের জানলা দিয়েই তার চোখ গিয়ে পড়লো রাজপথের ওপারে ক্যাম্পের একাংশে। একটা অনির্দিষ্ট বিষাদ বোধ করলো সে। বিষণ্ণতা। একটা ঝিমিয়ে আসা যেন। আর সেটা এই সকালেই, যখন একটা গোটা দিন সামনে প'ড়ে আছে। তা কি ক'রে চলবে? সকাল। অনেক সকালের তাজা ভাবের স্মৃতি। উঁ হুঁ হুঁ ক'রে একটা যে কোন সুরকে টেনে আনার সজ্ঞান চেষ্টা করলো বিমি। সকাল যে এখন।

মালতী এলো।

'কি করছ, বউদি।'

'মেয়েদের যা কাজ, রান্নার যোগাড় ক'রে নিচ্ছি।'

'মেয়েদের কাজ বুঝি রান্না করাই?'

'না, আহার্য যোগাড় করাও। ও বিষয়ে নানা দেশের মেয়েই পুরুষদের সাহায্য করে।'

'তার ফলে পুরুষরা অলস হয়।'

'তাও হয়। অলস হ'য়ে মদটদ খায়।'

'সেটাই তো খারাপ।'

'ওটা মেয়েরাই করেছে নিজেদের স্বার্থে।'

'আমাদের স্বার্থে?'

'তা বৈকি। অলস অবসরে আমাদের জন্য যে সব রঙীন জিনিস আবিষ্কার করে ওরা তারই লোভে। তার মধ্যে অবশ্য অনেক মিথ্যা কথার আবিষ্কারও আছে।'

মালতীর মন নরনারীর সাম্য নিয়ে কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, কঠিন হ'য়ে উঠছিলো। কিন্তু সেও হেসে ফেললো। বললো, 'দাও, আনাজগুলো কুটে দিই। তুমি ততক্ষণে উনুন ধরিয়ে ফেলো। ওটাতো চোখ বুঁজে আছে।' এই ব'লে সে বঁটি পেতে আনাজের ঝুড়ি নিয়ে ব'সে গেলো।

বিমি বললো, 'আমার যা আয়োজন তা তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। তুমি বরং বলো উদ্দেশ্যটা তোমার কি।' সে হাসলোও একটু।

ততক্ষণে আনাজের ঝুড়ির উপরে চোখ বুলিয়ে কি কি তরকারি বানানো যেতে পারে তা আন্দাজ ক'রে নিয়েছে মালতী। তার মোটা কালো রং-এর কিন্তু সুদক্ষ আঙুলগুলো চালিয়ে চালিয়ে পাশের থালার উপরে কেটে রাখতেও সুরু করেছে।

বিমলা হাওয়া দিয়ে উনুনকে একটু তেজী করলো, ভাত চাপিয়ে দিয়ে মালতীর কাছে এসে বসলো। সে হঠাৎ লক্ষ্য করলো। কাজের হাত মালতীর, কিন্তু নখগুলি কেমন সুন্দর রক্তাভ, যেন রঙে ডোবানো। আর আঙুলগুলোর গড়ন!

'কই, বললে না।'

'শোভাযাত্রা ক'রে সারা শহর ঘুরবো।'

'আর শ্লোগান?'

'তাও নিশ্চয়। আমরা এই শহরের প্রত্যেকটি লোকের কানে তুলে দেব এই, উদ্বাস্তুরা যেতে চায় না, তাদের জোর ক'রে তাড়ানো হচ্ছে। ভাবো দেখি, বউদি, ডুবন্ত লোক নৌকার একটা পাশ চেপে ধরেছে, আর তুমি তার হাতের উপরে মেরে মেরে তার হাত ছাড়িয়ে দিচ্ছ।'

জলের দেশের মেয়ে মালতী, হয়তো খেলার ছলে সঙ্গীদের মধ্যে এরকম ব্যাপার ঘটতে দেখেছে, তার থেকেই কল্পনায় এনেছে এই উপমা।

বিমি বললো, 'কিন্তু, মালতী, যদি নৌকাটা আরোহীদের নিয়েই ভারি হ'য়ে থাকে?'

'প্রমাণ সাপেক্ষ।'

'তা না হয় হ'লো। কিন্তু তোমাদের শোভাযাত্রায় আমি কি করব?'

'তুমি থাকবে না? তুমি না থাকলে আমাদের পাড়ার কোন কাজ মানায়? তাছাড়া তুমি নিজে ক্যাম্পে না থেকেও ওদের কথা এত জানো।'

এটাই মালতীর ধরন। মানানোর কথা যা সে বলেছে সেটা বিমলার পক্ষে কৌতুকের ব্যাপার। অনেক কথা আছে যা টুকরো টুকরো হ'য়ে বাতাসে ছড়িয়ে ছড়িয়ে কানে আসে। একথাটাও তেমনি। সব যোগ করলে এই দাঁড়ায়, বিমলার মুখ চোখের গড়নে এমন একটা মর্যাদা আছে যা এ পল্লীতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর কতগুলি ব্যাপারে তার নাকি একটা স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা আছে যা শিখতে হ'লে এ পল্লীর অনেককেই অনেকদিন ধ'রে চেষ্টা করতে হবে। ব্যাপারটার সূচনা সেই নারীশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দিনে। শহর থেকে একজন বড়োগোছের সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী এসেছিলেন সভাপতিত্ব করতে। এ পল্লীর মেয়েরা খুঁজে পাচ্ছিলো না কি ক'রে তাঁকে অভ্যর্থনা করা যায়। তখন বিমলা নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়েছিলো। তার সঙ্গে এমনভাবে আলাপ করেছিলো সে যেন ঘরের মানুষ।

মালতী বলে, 'প্রথম প্রথম সে মহিলাটি তো আদুরে বেড়ালের মতো গাল ফুলিয়ে শুধু হুঁ হাঁ করছিলো, তারপরে বিমলা বউদির কাছে হার মানলো। সব জানি ভাবটা ছেড়ে দিয়ে কেবল জিজ্ঞাসাই করতে লাগলো। আর চায়ের আসর! ভেবেছিলো বোধহয় গেঁইয়ারা জানে না। কিন্তু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বউদির চা করার ভঙ্গিটা মনে আছে তো? সিনেমা দেখেছো? তার চাইতেও মানানসই ভঙ্গি। দোকান থেকে ধার ক'রে আনা অত

বাসনপত্র কাঁটা চামচ কি কাজে লাগে তাতো দেখলে। কেমন টুকটাক ক'রে সাজিয়ে দিলো। একটাও আর বাড়তি ব'লে মনে হ'লো না। অথচ বিমলা বউদিকে সিনেমায় যেতে দেখছো?'

কেন যে টেবিল সাজাতে জানে সে কথা ব'লে আর কি হবে? তারজন্ত দুঃখও আর হয় না।

কৌতুকের ব্যাপার দেখো মালতীর মনের। বিমলার পক্ষপাতী সে এইজন্তে যে উঁচু মহলের আদব কায়দায় সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। অথচ উঁচুমহলের সম্বন্ধে যে কোন কথা বলতে গেলেই মালতীর চোখ যেন জ্ব'লে ওঠে। ঘৃণায় নাক উঁচুতে যায়।

বাকি থাকলো ওদের সম্বন্ধে জানার কথা। জানে হয়তো কিছু কিছু ক্যাম্পের অধিবাসীদের সম্বন্ধে। কিন্তু ওদের মনের কথা জানলেই যে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ হয় কি ক'রে? আর হ'লেও কি লাভ?

মালতী বললো, 'আর কি কুটবো বলো।'

'আর দরকার হবে না। এবার তুমি ওঠো। এর পরে তুমি রান্না ক'রে দিতে চাইবে।'

'তা চাইবোনা যদি তুমি রাজী হও।'

'ভেবে দেখি বললে হয় না?'

'না; তা হ'লে বেলা বারোটায় আমি ওদের নিয়ে আসছি।'

এই বলে মালতী চ'লে গেলো হয়তো অন্ত কারো ছেলে কোলে ক'রে রেখে রান্নার সাহায্য করতে কিংবা কারো হয়তো রান্না করতেই ব'সে যাবে। ব্যাপারগুলি সম্ভাব্য কল্পনা নয়, ঘটতে দেখেছে সে।

মালতী চ'লে গেলো। আনাজ কুটবার সময়ে যা নজরে পড়েছিলো সেই আঙুলগুলির কথাই মনে হ'লো বিমলার। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যই বোধ হয় কথাটা। তারপর মালতীর মুখের কথা মনে হ'লো।

উনুনে তরকারির কড়া চাপিয়ে ভাবলো সে। মানুষের কখনো তিলফুল নাসা হয়? কখনো শ্রুতি পরশে এমন চোখ হয়? অধর কখনো বান্ধুলি সদৃশ হ'তে দেখেছো? যুবকরা যেন কবিদের মতোই পাগল। কবিরা বোধহয় কল্পনা করে প্রিয়তমা নারী সম্বন্ধে এমন সব অসম্ভব তুলনার সাহায্যে। কিংবা হয়তো কথাই। কথার নেশায় বলা, ছন্দের পূরণের জন্ত। আকস্মিক

উদ্ঘাটনের মতো কথাটা সঙ্কুচিত হ'লো তার মনে। একটু দ্বিধা করলো। তারপর হাসি হাসি মুখে নিজের মনে জেগে ওঠা এই প্রত্যয়কে চেপে ধ'রে সে যেন মনের সামনে বসিয়ে দিলো। কবিরাই এসব করিয়েছে। তারাই সৌন্দর্য সম্বন্ধে এ ধারণাগুলি বদ্ধমূল ক'রে দিয়েছে মানুষের মনে। আর সে জন্যই মালতীর মতো স্বাস্থ্যবতী মেয়েও কোন যুবককে আকর্ষণ করতে পারে না। সুগঠিত নিতম্ব, সু-উন্নত বক্ষ। মানুষের জীবন প্রবাহ সংরক্ষণের পক্ষে এমন উপযুক্ত কে মালতীর মতো। তবু—

মানুষের মন আদিম অবস্থায় নেই এই বোধ হয় এ বিষয়ে উত্তর হ'তে পারে। কবিরা কি তাদের অনেক দিনের চেষ্টায় নারী সম্বন্ধে পুরুষের রুচি সত্যি বদলে দিয়েছে? তা যদি সত্যি হয় অন্য অনেক ব্যাপারে এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। বাইরে থেকে এতদিন যাকে কারণ ব'লে মনে হয়েছে সেটাতো কারণ নাও হ'তে পারে। মনে করো রাজনীতি। মানুষের আত্মপ্রসারের তাগিদেই যদি এককালে গ'ড়ে উঠেও থাকে, এখন আর তা হয়তো হয় না। অনেক কথা বলেছে রাজনৈতিকরা। সে সব কথার টুকরো টাকরার কোন একটা মনে গেঁথে যেতে পারে। সেটাই তখন নিজের আত্মপ্রসারের তাগিদ ব'লে ভ্রম হ'তে পারে। ওই ক্যাম্পে যারা আছে তারা কি জানে কোনদিকে তাদের সত্যিকারের তাগিদ? এমন কি হ'তে পারে মালতী যা বলছে তাই তারা মেনে নিচ্ছে? আর সেই কথাগুলিকেই নিজের কথা মনে করছে?

কি ছাই পাঁশ ভাবছি ব'সে এই ভেবে উঠে দাঁড়ালো বিমলা। ঘড়িটা একবার দেখে আসা দরকার।

তথাপি ঘড়ি দেখে ফিরে আসতে আসতে সে এই স্বগতোক্তি করলো: মাটিতে আঁকা বাঘ যদি শঙ্করকেই খেয়ে থাকে আমরা কোথায়? নিজেকে চেনা কি এতই সহজ? বেশীর ভাগ সময়েই কি অন্যের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার জায়গায় বসিয়ে দিই না? অন্য কারো প্রভাব মেনে নিইনা?

ঘড়িতে নটা বেজেছিলো। রান্নাও প্রায় হ'য়ে গেছে। কতটুকুই বা সময় লাগে এই সামান্য রান্নার আয়োজন করতে। ভুবনবাবুকে ডাকতে হবে না। নিজেই স্নান ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে এসে দাঁড়াবে। বিমি হাত চালিয়ে বাকি কাজটুকু সারতে লাগলো।

ভুবনবাবু খেতে বসলে অনুমতি নেয়ার ভঙ্গিতে সে বললো, 'মালতীদের সঙ্গে গেলে ফিরতে দেরি হতে পারে।'

'তা হ'ক না একদিন।'

ভালো পার্টনার ভুবনবাবু—অনেকবারের মতোই আবার মনে হলো তার।

কিন্তু সেদিন শোভাযাত্রায় তার যাওয়া হলো না। কারণটা শুনে মালতী বললো, 'তাহলে আর কি করা।'

শোভাযাত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখলো। সবার আগে মালতী। তার পিছনে যেন গোটা ক্যাম্পটাও ভেঙে চলেছে। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। এই পিচ বাঁধানো পথে এত ধুলো ছিলো! মাথার উপরে দুপুরের রোদ। যুবক, বৃদ্ধ, ছেলে কোলে ক'রে মা, কোলকুজো বৃদ্ধা। ভাঙা পুতুলের মিছিল। একটা সমঅনুভব বোধ করলো সে। একটা প্রবল কিছু করা উচিত ওদের। তা সে যাই হ'ক। ওদের চিৎকার ক'রে বলা শ্লোগানের মতোই প্রবলভাবে ঘটা ভালো। উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এসে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

শোভাযাত্রাটা এক সময়ে চোখের বাইরে চ'লেও গেলো।

এখন একটানা অবসর। ভুবনবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। ঘরটা গুছিয়ে দেবার দৈনন্দিন সময় এখনও অনেক দূরে। সে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিলো সে। কিন্তু কতটুকু সময়ই বা তার জন্য ব্যয় করা যায়। অবসরটাই আবার ফিরে এলো। এবার সে ভুবনবাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বই? বই পড়বে? গত পাঁচ সাত বছরে সে এক লাইন পড়েছে কিনা সন্দেহ। তার মনে হয়, বই হাতে নিয়ে পড়তে বসা তাকে মানায় না। যেমন মানায় না, ধরো, জুতো পায়ে দেয়া কিংবা রঙীন শাড়ি পরা। একটা সামঞ্জস্যতার বোধই যেন তাকে বাধা দেয়। যা স্বাভাবিক রুচি হতে পারতো, তা থেকে রুচিবোধই যেন তাকে সরিয়ে রাখে। দূরে দাঁড়িয়ে ভুবনবাবুর হাতে মেলে ধরা খবরের কাগজের বড়ো বড়ো অক্ষরগুলোকে না দেখার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে চোখ রাখে সে কচিৎ, কিন্তু তাকে পড়া বলে না।

ভুবনবাবুর টেবিল থেকে একখানা বই নিলো সে। উপন্যাস নাকি? উপন্যাস কথাটা মনে হ'তেই হাসি পেলো। জলো জলো, কি অসম্ভব রকমের অগভীর হয় উপন্যাস জীবনের চাইতে। উপন্যাস সে এক সময় পড়তো। এক সময়ে সে অনেক কিছুই পড়তো। সেই অনেক অতীতের ব্রহ্মদেশের

কথা নয়। তারপরেও। বরং বলা যায় বজ্রযোগিনীতে পড়াটাই একমাত্র কাজ ছিলো। তার এবং ভুবনবাবুরও বটে।

উঠোনে একটা শব্দ হ'লো। বইটা বন্ধ ক'রে যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ ক'রে দাঁড়ালো। কিছুই হয়নি। রান্নাঘরের পিছনে যে কাঁঠাল গাছটা আছে;তা থেকে ছোট একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু বই পড়া আর হ'লো না। আর একদিন সে চেষ্টা করবে। পড়লে এমন কিছু তাজ্জব ব্যাপার হয় না। পায়ের শব্দ মনে ক'রে বই বন্ধ করতে হ'লো।

অবসর আজ ভোগ করতেই হবে। অথচ ভেবে দেখো এ সময়ে তো রোজই অবসর। কাজ না থাকার এই দুপুর রোজই আসে। কোন কোনদিন কেন এমন ফাঁকা হ'য়ে যায়? মনে মনে সে শোভাযাত্রার চলার শ্রম দিয়ে এই সময়টুকুকে ভ'রে তুলেছিলো। তা থেকে বঞ্চিত হ'য়েই হয়তো এমন হচ্ছে—ভাবলো সে লুকোচুরি খেলার মতো। রাজনীতি নিয়ে ছাঁইপাশ ভেবেছে, সেটা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তার দেহের মধ্যে যেন কথাটা লুকিয়ে থাকে। দেহের কত কোষেরই তো মৃত্যু হচ্ছে রোজ। কথাগুলোও যদি মরে যেতো।

ভুবনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে এবার যেন ফাদার ফিলিপটকেই দেখতে পেলো সে। চশমা চোখে হাসিমুখো ফাদার। মাথার হলুদে চুল শাদা হ'য়ে আসছে। গায়ের রং কাগজের মতো শাদা। আর তার চারিদিকে ভিড় ক'রে ম্যাকব্রাইডের সাংবাদিক গোষ্ঠি।

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলো সে। চারিদিকে তাকিয়ে হাসপাতালের পূর্বপরিচিত আসবাবপত্র দেখে বুঝতে পেরেছিলো কোন হাসপাতালের কেবিনে সে আছে। নিজের একখানা হাত চোখের সামনে মেলে ধরেছিলো। একগাছা চুড়িও হাতে নেই। তারপর হাতখানাই গলার কাছে এনে দেখলো হারটাও নেই গলায়। তারপর তার মনে হ'লো ঘটনার কথা। কিছুই কি আছে? উঠে বসবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলো তার পা এবং কোমর ফিতে দিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা। তারপর সে নরম বালিশে মাথা রেখেছিলো। শয্যাটা পরিচ্ছন্ন; বুকের ভিতরে কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। ঝকঝকে চুনকাম করা দেয়াল···। জ্বরের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে।

সুস্থ হ'য়ে সে দেখলো সে বিশপের পরিচারিকাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। হসপিট্যালের মালিক বিশপ। তার বাংলোর লাগোয়া হসপিট্যাল। যতদূর মনে পড়ে হসপিট্যাল থেকে একজন পরিচারিকাই তাকে নিয়ে গিয়েছিলো বাংলোর ভিতরে। দুপুরে আহার হয়েছিলো পরিচারিকাদের টেবিলে। বিশ্রামের জন্যও খানিকটা জায়গা। কারণ তখন বিশপ তার এক নিয়মিত পরিক্রমায় বেরিয়ে গিয়েছিলো। বিশপ ফিরে না এলে তার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা যাবে না।

দিন তিনেক পরে বাংলোয় ফিরে বিশপ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো, 'এবার বলো তোমার বাড়ি কোথায়?'

সব গোলমাল হ'য়ে গেলে যেমন হয় তেমন নির্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলো সে। বাড়ি কোথায় তা তো সে ভুলে যায়নি, তবু এ প্রশ্নটার উত্তরই সে দিতে পারেনি। বরং মনে করার একটা তাগিদ অনুভব করলো—এই বিদেশি মুখটিকে সেই রাত্রির বাড়িতে পাশের কামরায় দেখেছিলো কিনা।

বিশপ হাসিমুখে প্রশ্ন করেছিলো, 'বাড়ি যাবে না?'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো সে অন্তরে অন্তরে। চোখে জল এসেছিলো, মুখে শব্দ হ'লো না। এরকম ঘটাটা বিজ্ঞানসম্মত কি না কে জানে, বিমলা এখন বিশ্লেষণ করে। কনভেণ্টের শিক্ষাই মনে প'ড়ে গিয়েছিলো হয়তো ফাদারের সামনে। হ্যাঁ, কনভেণ্টের সেই পাদরির মতো একটা ছোট ক্রুশও ছিলো ফাদারের গলায় ঝোলানো।

আর ফাদারের মুখের চেহারা। দয়া, দয়ারই তৈরি মূর্তি বলতে হয়। চোখের চশমাটা। বাঁধানো ঝকঝকে দাঁতগুলি। কিছুই যেন দয়ার সেই রূপটির ছন্দহানি ঘটায়নি। বোধ হয় ওদের দেশে ভালো সিনেমা আর্টিস্ট দিয়ে দয়ার পোজের ছবি তৈরি করিয়ে সেটাকে অনুকরণ করার অভ্যাস করে ওরা। বিজ্ঞানের দেশ ওদের। কি ক'রে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করা যায় সে সম্বন্ধে ওরা মোটা মোটা বই লিখে থাকে। হয়তো পাদরিদের মুখের চেহারা কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও ওদের বই আছে।

এ চিন্তা অবশ্য পরবর্তী কালের। তার আগে ফাদার তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো। অনেক রকমের কাজই ছিলো তার বন্দোবস্তের আওতায়। নারীদের কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। একটি দু'টি ক'রে দিন যেতে যেতে অনেকগুলি দিনই চ'লে গেলো। শেষের দিকের দিনগুলি লঘুপদেই যাচ্ছিলো।

পরিচারিকাদের মধ্যেই থাকা। তাদের টেবিলে ব'সে আহার। নিদ্রার জন্ত একটি কুঠরি পরিচারিকাদের মহলেই। পরিচ্ছন্নতা ছিলো। আর ছিলো প্রার্থনা। শুধু রবিবারে নয়। অন্যদিনের সকালেও ফাদার যখন প্রার্থনা করতেন কিংবা অধস্তন পাদরি বেঞ্জামিন দাস, সেও চোখ বুজে হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করতো। কখনও কখনও অবশ্য সে অস্থির হ'য়ে যেতো। পিউএর আসনে ব'সে থাকতে পারতো না, জানুপেতে বসতো মেঝেতে। এ ব্যাপারেও তাকে সাহায্য করেছে নাকি বাল্যের অভ্যাস, কনভেণ্টে পড়ার সময়ে যা সে অর্জন করেছিলো? আর তার আন্তরিকতা গোপন ছিলো না, আলাপের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো।

একদিন এলো ম্যাকব্রাইড এবং তার বন্ধুরা। ম্যাকব্রাইড যে সে লোক নয়। সাংবাদিক নয়, সংবাদস্রষ্টা। সাহিত্যিকও বলা যায়। রাজনীতির ধূম্রজাল ভেদ ক'রে চলে তার মনীষা। পৃথিবীর সব দেশে, অন্তত সভ্য দেশগুলিতে তো বটেই, তার বইগুলি আগ্রহসহকারে পড়ে লোকে। রাজনৈতিক বক্তৃতার ভিত্তি হয় তার নির্ধারিত তথ্য। অথচ কি সরল কথাবার্তা। বড়ো ভাই যেন এসেছে বাড়িতে, পরিচারিকারা পর্যন্ত তার ভদ্র ব্যবহারে অনুভব করলো।

ম্যাকব্রাইড। টকটকে লাল চুল, ধাতবপরিধিহীন কাচের চশমা। প্রজাপতি আঁকা কালচে লাল রং-এর টাই। একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। সারা পৃথিবীর পথিক ব'লে কোন দেশের স্মারক হিসাবেই বোধ হয় সে দেশের রীতি অনুসারে দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু একদিনের জন্যই এসেছে। যাবে ইন্দোনেশিয়া, পথে থেমেছে। ফাদার ফিলিপটের ঠিকানা জানা ছিলো, তাই সৌজন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছে। কিন্তু সাংবাদিক তো। উট যেমন মরুভূমিতে জলের গন্ধ পায়।

বিমলাকে যখন ডেকে নিয়ে গেলো তখন ডিনার শেষ হয়েছে।

'কি হয়েছে?'

'ফাদার ডাকছেন আপনাকে।'

'আমাকে? কেন? খাবার ঘরে?'

বিমলা টেবিলের পাশে দাঁড়ালো।

ফাদার বাংলায় বললো, 'তুমি আমার সাক্ষী। ম্যাকব্রাইড বলছে আমি ওর সঙ্গে রসিকতা করেছি।'

বিমলা কি বললো সে ম্যাকব্রাইডের সুবিধার জন্য তার ইংরেজি তর্জমাও করে দিলো।

ম্যাকব্রাইড বিমলাকে ইঙ্গিত ক'রে বললো, 'কফি?'

ফাদার উত্তরটা যুগিয়ে দিলো, 'ভদ্রতা সহকারে প্রত্যাখ্যান করো।' বিমলা কিছু বলার আগেই বললো, 'সি রিফিউজেস উইথ থ্যাঙ্কস্।'

ফাদার বললো, 'এবার তুমি বলো সেখানে কি হয়েছিলো। কিছুইতো নয়। সে কথাটাই বলো। একটা সাধারণ ট্রেন ডাকাতির চেষ্টা। তাই নয়? কারো প্রাণ গিয়েছে ব'লে শোনা যায়নি। দু-একজন আহত হয়েছে। আর নারী ধর্ষণ—অসম্ভব। অন্তত তোমার চোখে তা পড়েনি। এবার তুমি বলো আমি তার ইংরেজি অনুবাদ সাহেবকে বলবো। নাও ইউ উইল হিয়ার।' ব'লে ফাদার আহারতৃপ্ত হাসিমুখটা ফিরালো ম্যাকব্রাইডের দিকে।

কে যেন গলাটা চেপে ধরলো বিমলার। শত চেষ্টা করলেও একটা তীব্র আর্তনাদ, একটা অব্যক্ত প্রবল প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু তার গলায় ফুটবে না। বেঞ্জামিন ভাগ্যক্রমে বসেছিলো এমন জায়গায় যেখান থেকে বিমলাকে সাহায্য করা যায়। সে টেবিলের পরে রাখা বিমলার আঙুলগুলোর উপরে চাপড়ে দিলো আস্তে আস্তে। মৃদুস্বরে বললো, 'সাহেব যা বললো তাই হ্যাঁ ক'রে যাও।'

'সাহেব যা বললো?' মানুষ কি ভুলে যেতে পারে? ভুলে থাকা যায় হয়তো কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু এতদিন পরেও কি সে ভুলতে পেরেছে। ফাদার এটুকুর জন্যই, এই স্তব্ধতার মধ্যে বলা 'সাহেব যা বললো' এই শব্দ তিনটির জন্যই যেন অপেক্ষা করেছিলো। হাসিমুখে বললো, 'সি সেজ—হোয়াট এভার আই হ্যাভ সেড্—অর্থাৎ আমি যা বলেছি তাই সত্য।' বিমলা এবং বেঞ্জামিনের সুবিধার জন্যই যেন ফাদার বাংলাতেও বললো। আর সুন্দর একটা জ্যোতির্ময় হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে যেন একটা ঘৃণ্য পরিবাদ থেকে মানবজাতিকে সে উদ্ধার করতে পেরেছে।

কিন্তু বিমি আর একটু শুনতে পেয়েছিলো।

একজন সাংবাদিক বললো, 'কিন্তু আমরা ওদেশের কাগজে দেখে এলাম।'

ফাদার বললো, 'সন, ভুলে যেয়ো না আমাদের এই মিত্র দেশকে, এই বন্ধুদেশকে সব রকমে বিব্রত করাই ওদের রাজনীতি।'

ম্যাকব্রাইড বললো, 'তাহলে এদেশের পুলিস এবং অন্যান্যরা অপরাধীদের সাহায্য করেনি ?'

কথাগুলি ইংরেজিতে হচ্ছিলো। আর একটা শূন্যতা যেন যেখানে হৃদয় ছিলো। সেই শূন্যতার মধ্যে যেন মনে হচ্ছিলো দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য, কেন সে ইংরেজি বুঝতে পারছে।

কোথা থেকে কি যেন হ'য়ে গিয়েছিলো। গাড়িটা হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো নিস্তব্ধ ঝিঁ ঝিঁ ডাকা একটা মাঠের মধ্যে। কোথায় এলাম বুঝবার উপায় ছিলো না। গাড়ির হলুদে আলোয় রেলপথের ধারের ঝোপঝাড়কে গভীর ক'রে দেখাচ্ছিলো। তারপর কোলাহল আর আর্তনাদ সুরু হ'লো। এঞ্জিনের দিক থেকে গার্ডের গাড়ির দিক থেকে। অনেক কণ্ঠের উল্লাস রব, অনেক কণ্ঠের আর্তনাদ। জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে পাশের ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় সাহেবদের লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ভালো ক'রে কিছু দেখবার আগেই বাইরের হেঁচকা টানে তাদের কামরার দরজাটা খুলে গেলো। বাইরের সেই উল্লাস রব আর আর্তনাদ এবার বুকের পাশে।

কোথা থেকে কি হ'য়ে গেলো। যে বউটির সঙ্গে গল্প করেছিলো সে ততক্ষণ তার কথা মনে আছে। আতঙ্কে সে তার স্বামীর একখানা হাত চেপে ধরেছিলো। তাকে যখন গাড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছে তখনও সে সংজ্ঞাশূন্য স্বামীকে ধ'রে আছে। তার স্বামীর দোমড়ানো মোচড়ানো দেহটা শেষ পর্যন্ত আধখানা গাড়ির মধ্যে আধখানা পাদানির উপরে ঝুলতে লাগলো। গাড়ির সব আলোগুলো নিবে গিয়েছিলো। উল্লাসকারীদের হাতে টর্চ জ্বলছে। অসংখ্য টর্চের আলোয় তারা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিমলা হয় ধাক্কা লেগে প'ড়ে গিয়েছিলো কিংবা ওই ভাবেই তাকে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। ডান পাটা মচকে গিয়েছিলো। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারলো না। প'ড়ে গেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। উঠে দাঁড়িয়ে কি হবে মানুষ তা ভাবে না।

তার শাড়িখানা ফালা ফালা হ'য়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো। মচকানো পাটা সে মাটিতে পাততে পারলো না। আবার এক শ্বাপদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সে প'ড়ে গেলো। চারিদিকে শ্বাপদের চোখ—টর্চগুলো জ্বলছে। দুড়দাড় ক'রে তারা এমাথা থেকে ওমাথা ছুটছে। কে একজন তার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেলো। এর একজনের বুটের ধাক্কা লাগলো তার মুখে। তারপরে দু-তিনজন এসে

একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিলো তাকে ঘিরে। কয়েক জোড়া হাত তার হাত পা মাথা চেপে ধরেছিলো।

জ্ঞান হওয়ার মতো একটা ভাব হয়েছিলো, বোধ হয় তখন শেষ রাত। আকাশে দু'একটি তারা। কোমর থেকে পা কি ট্রেনে কাটা গেছে? বুকের মধ্যে খচখচ ক'রে' বিঁধছে নিঃশ্বাস নিতে। শুকনো ঘাস হাতে লাগলো। পায়ের দিকটা কি ডোবায়? মাটিটা সেদিকে ভিজে। তরপরই আবার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিলো।

বেঞ্জামিনই বলেছিলো। বেঞ্জামিন তাকে সত্য কথা বলতো। যা মানায় তাই সত্য ছিলো না বেঞ্জামিনের কাছে, যা ঘটে তাও সত্য ছিলো। অন্তত কখনো কখনো বিমলার সামনে। সে বলেছিলো এতদিনে সত্যটা প্রকাশ পাবে। ম্যাকব্রাইড বিখ্যাত সাংবাদিক। তার কাছে সত্য গোপন থাকে না। ফ্ল্যাস ক্যামেরায় তোমাদের ছবি তুললো বোঝনি? প্রতিকারও হবে। তুমি কি ভাবো ঘটনা জানার পর পৃথিবীর সৎ মানুষদের ক্রোধ জেগে উঠবে না। পৃথিবীতে কি সৎ মানুষ নেই মনে করো!

একটু গোলমাল হ'য়ে যায় বিমলার। এ কথাগুলো কখন বলেছিলো বেঞ্জামিন? সেই ভোজের টেবিলে যাওয়ার আগে তাকে আশা দিতে? না কি পরে আশ্বাস হিসাবে?

কিন্তু আর ভাবতে চায় না সে রাজনীতির কথা। অস্থির হ'য়ে উঠেছে তার শরীর। বুকের ভিতরে কি যেন হাঁপাচ্ছে। অনেক পুরনো কথা। অনেক পুরনো কথার সামনে তুমি তো স্থির থাকতে পারো।

কে যেন বাইরে ডাকছে।

বিমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

দুটি স্ত্রীলোক। একটি শিশু। স্ত্রীলোক দুটির একজন প্রৌঢ়া, দ্বিতীয় জনের ঘোমটা টানা দেখে মনে হয় তার বয়স কম। শিশুটি বছর তিনেকের হবে। রোগা, রোগা। কিন্তু এখনও বোধ হয় রোগগ্রস্ত নয়।

শিশুটি পথের ধারে দাঁড়িয়ে আগাছার পাতা ছিঁড়ছে। ওই তার খেলা।

প্রৌঢ়াটি এক নিমেষে চোখে একটা অভ্যস্ত আর্ততা নিয়ে এলো, কণ্ঠস্বরকে করুণ ক'রে ফেললো—'কিছু দাও মা।'

'কি দেবো?'

'আর কিছু না দেও, ছেলেটার জন্ম একটা পুরনো ফাটা জামা।'

'কোথায় পাবো?'

'দাও মা।' কাতরিয়ে উঠলো প্রৌঢ়া।

কিন্তু ঘোমটা টানা বউটি এবার এগিয়ে এলো। ঘোমটা-টা খাটো করলো। প্রৌঢ়া আর কি বলতে যাচ্ছিলো তার সকরুণ আবেগকে আরও মর্মস্পর্শী করার জন্য, বউটি কথা বললো।

'এ বাড়িতে ছোট ছেলে নেই মাসি।' তারপরে বিমলাকে বললো, 'এই তোমার বাড়ি, মা ঠাকরুণ? তবে তো তুমি এখনও আমাদের ছেড়ে যাওনি।'

মরণচাঁদের বউ। তার মুখটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

বিমি কথা খুঁজে না পেয়ে বললো, 'কোথায় আর যাবো?'

মরণচাঁদের বউ বললো, 'তুমি যে এখানে আছ, মানি এই শহরেই, তা মনে হ'তো। কিন্তু সাহস ক'রে খুঁজি নাই।'

বিমি বললো, 'আমাকে দিয়ে কি দরকার?'

দরকারের কথা কিছু নয়। একটা আত্মীয়তার বোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। সাময়িক একটা নৈকট্যের অনুভব। কিন্তু সে বোধকে কথায় প্রকাশ করতে পারার মতো ভাষাজ্ঞান নেই মরণচাঁদের বউ-এর।

প্রৌঢ়াটি কাজেই বেরিয়েছিলো। এরকম দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় ছিলো না তার।

সে বললো, 'তুই কথা ক, আমি দু-এক বাড়ি ঘুরে দেখি।'

প্রৌঢ়াটি ছেলেটিকে টেনে নিয়ে ভিক্ষা করতে এগিয়ে গেলো।

'কে?' বিমি প্রশ্ন করলো।

'মাসি গো, ঠাকরুণ।'

'মাসি আবার কোথায় পেলে তুমি?'

'আমার না তেনার।'

'মরণচাঁদের? আর ছেলেটা?'

'বলে ওর নিজের। তা মনে হয় না। ওই আঁশের মতো খসখসে গা, কাঠের মতো শক্ত হাত পা, তার বুকের মধ্যে কি এমন নরম ছেলে তৈরী হয়?'

মাসির উপরে অসন্তুষ্ট মরণচাঁদের বউ। নানা কারণ থাকতে পারে তার এবং সেগুলি প্রকাশ করতেও চায় সে, মনে হ'লো তার ভাবে।

কথা বলার দরকার ছিল বিমিরও। সে বললো, 'বসো বউ।'

'না, মা ঠাকরুণ, বসি না। ব'সে থাকলে ক্যাটক্যাট ক'রে কথা শুনাবে ক্যাম্পে ফিরে। বোনপোও সায় দিবে। ভিক্ষা করতেই হবে ওর সঙ্গে। তা ভিক্ষা তো হয়ও। এই শাড়িখানা ভিক্ষা ক'রেই পাওয়া। পুরনো। তা হলিও পাঁচ সাত বছরে এমন পরিষ্কার শাড়ি পরি নাই।'

মরণচাঁদের বউ-এর পরনের শাড়িখানা পুরনো, দু এক জায়গায় রিপু করাও বটে। কিন্তু এককালে সেটা মাঝারি দামের ভালো শাড়ি ছিলো।

কাজেই সে চ'লে গেলো।

বিমলার প্রথমেই মনে হ'লো মরণচাঁদের বউ-এর একটা নাম আছে। মরণচাঁদের মুখে সোদামুনি। সৌদামিনী নাম ছিলো মেয়েটার। সভ্যতার কাছাকাছি বাস ছিলো। গ্রামে হ'তে পারে, কিন্তু সৌদামিনী কথাটা চালু হওয়ার মতো আবহাওয়া ছিলো।

সে চ'লে যাওয়ার আগে বিমি তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'শোভাযাত্রায় যাওনি তুমি?'

'তিনি গেছে।'

দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিমলা আবার অন্দরে ফিলে এলো। খানিকটা সময়ের জন্য যেন সে বাইরে এসে হাঁফ ছাড়তে পেরেছিলো, আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। বন্দী ঠিক নয়। উপমাটা যেন স্বগৃহে অন্তরীণ। খানিকটা স্বাধীনতা আছে কিন্তু জীবন-স্ফূর্তির চারদিকে অদৃশ্য দেয়ালটাও আছে। আর সে দেয়াল তার অভিজ্ঞতা?

রাজনীতি কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো এসে পড়ে। কারণ নিশ্চয়ই আছে। সাইক্লোনের কি আর কারণ থাকে না? কিন্তু যারা সেই আবর্তঝড়ে পড়ে তাদের তখন কারণ বিশ্লেষণের কথা মনে থাকে না। পরেও ক্ষয় ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দিয়ে সেগুলির জন্য বেদনা অনুভব করতে করতে কারণ বিশ্লেষণের কথা কারো মনে পড়ে না। যদি কেউ তা করতে যায় তাকে হৃদয়হীন যুক্তি-সর্বস্ব ব'লে সমাজে বিদ্রূপ করা হয়। যুদ্ধটা এমনি ব্যাপার। আর দেশ বিভাগ। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের চাইতেও নির্মম এই ব্যাপারে মন যেন কারণ খুঁজবার জন্য দিশেহারা হ'য়ে মাথা কুটতে থাকে। যুদ্ধের ব্যাপারটা

অধিকতর দূরের ব'লেই কি এমন হয়? কিংবা এ ব্যাপারটা ধুঁকে ধুঁকে মরার মতো কিছু। মৃত্যু ছুটোই। কিন্তু বজ্রপাতের মৃত্যু কি ধীরে ধীরে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে সচেতন ভাবে এগোনোর চাইতে কম ক্লেশদায়ক নয়? আর কখনই যেন ভোলা যায় না এর কারণ রাজনীতির সঙ্গে যেন কোন ভাবে জড়িত, যে রাজনীতি এখনও শেষ হ'য়ে যায় নি।

বিমির চোখ ছুটি টলমল করলো। হাতের আঙুলগুলো অস্থির হ'য়ে নড়লো। কত রূপ রাজনীতির। ফাদার ফিলিপটের চেহারাটা আবার চোখের সামনেই যেন দেখতে পেলো সে। কিছুই হয়নি, তাই এই ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে মরণচাঁদ আর তার বউ সোদামুনি। কতদূরে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা কে জানে। সেই ঘটনার পরেই গৃহত্যাগ করেছে তারাও। বিমি নিজের কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তিকেই তারিফ করলো যেন। সিনেমা আর্টিস্টের অভিনয় থেকে না শিখলেও চলে। উদ্ভাবিতটাকে বদলালো সে —হয় তো ভালো কোন চিত্রকর দিয়ে দয়ার অভিব্যক্তি আঁকিয়ে নেয়, আর তা থেকে মুখভঙ্গি অভ্যাস করে ওরা।

বিমির চিন্তা মোড় নিলো এখানে। অভ্যাসই বলতে হবে। অভ্যাসটা ওদের এমন হ'য়ে যায় যে সেটাই ওদের চালনা করে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার চাইতে অভ্যাস।

বেঞ্জামিন সে রাত্রিতেও শয্যার পাশে নতজানু হয়ে ব'সে প্রার্থনা করেছিলো। যে শয্যা, অন্তত বেঞ্জামিনের হিসাবে, কিছুক্ষণ বাদেই অবিবাহিত নরনারীর সঙ্গমশয়নে পরিণত হবে। দরজার আড়াল থেকে বিমি দেখেছিলো। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছিলো বেঞ্জামিনের প্রার্থনা। সেটা যদি অভ্যাস না হয় তবে বোধ হয় তা বিমিকেই এই দেখানোর জন্য যে শয্যাটাকে তার প্রার্থনা পবিত্র করছে।

ধর্ম আর রাজনীতি। কোথায় ধর্মের শেষ আর রাজনীতির সুরু? ধর্ম আর রাজনীতি যেন হাত ধরে চলছে।

এই হলুদমোহন ক্যাম্প ধর্মের তৈরি। বাহ্, বেশতো। কথাগুলোকে জোড়া দিয়ে বাক্যটা খাড়া ক'রে বিমি অবাক হ'য়ে গেলো। এ বাক্যটা সত্য হ'তে পারে নাকি? মরণচাঁদ ধর্মের জন্য দেশত্যাগ করেছে। ধর্ম? গত বছর ক্যাম্পে দুর্গোৎসব হয়েছিলো। ক্যাম্পের কর্মচারীরা চাঁদা দিয়েছিলো। শহরের বদান্য ব্যক্তিদের কাছে থেকেও আদায় হয়েছিলো। এমন কি ক্যাম্পের

অধিবাসীদের সামান্য ভাতা থেকেও। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিলো। ক্যাম্পের প্রধান কর্মচারী অজয়ের কিছু নাম হয়েছিলো। কিন্তু পুজো কি কোন অন্ধকার দূর করতে পেরেছিলো ?

ছলনা ! একদিক দিয়ে ছলনাই বলা যেতে পারে। একদল অন্য দলকে ছলনা করছে এবং তা করতে করতে নিজেরাও ছলিত হচ্ছে। অথবা নিজেদের ছলনা ক'রে ক'রে সর্বব্যাপী এক ছলনামণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে ? নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো ছলনাও গ্রহণ করছি অস্তিত্বের জন্য।

বিমির চাহনির পরিবর্তন হ'লো। বেদনার চিহ্ন দেখা দিলো সেখানে।

ম্যাকব্রাইডের ঘটনার পরেও ওদের ধারণাটা টিকেছিলো, অদ্ভুত মতি আছে ধর্মে বিমির। বোধ হয় সে প্রার্থনায় অনুপস্থিত থাকতো না ব'লেই। এমন কথাও শোনা যেতো হয়তো সে ধর্মান্তর গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফাদার ফিলিপট একদিন বিশেষ প্রার্থনা ক'রে বিশেষ কতকগুলি প্রক্রিয়ার মধ্যে তাকে মানবপুত্র যীশুর করুণার অধিকারী করবে। এই বিষয়ে বেঞ্জামিনের উৎসাহ ছিলো সব চাইতে বেশী। প্রার্থনা ক'রে মন্দির থেকে ফিরতে ফিরতে বেঞ্জামিন কোন না কোন সুযোগে তার পাশে পাশে চলতে সুরু করতো। একমাসে যতটুকু সান্নিধ্যে এগোনে যায় তার চাইতেও কাছে আসবার চেষ্টা ছিলো তার।

কিন্তু ফাদার ফিলিপটের বাংলোর আশ্রয় পাওয়ার এক মাসের মধ্যেই সংবাদ এলো একটা। যশোর জেলায় ফাদারের যে ছোট গির্জা আছে সেখানকার কর্মচারী অসুস্থ। প্রার্থনা বন্ধ।

ফাদার বেঞ্জামিনকে ডেকে পরামর্শ করছিলো। যশোরের কর্মচারীটি এক বছরে তিনবার অসুস্থ হ'লো। তার বদলির দরকার। সে বরং যশিদি যাক। বেঞ্জামিন কি যশোরের ভার নিতে পারে ? তা যদি পারে সেখানকার ছ' বিছানার হাসপাতালটাকে এ সুযোগে বড়োও করা যায়। কারণ বেঞ্জামিনের অভিজ্ঞতা আছে হাসপাতাল সম্বন্ধে। কিছু ফাদারের আত্মজিজ্ঞাসা, কিছু আলোচনা। আর সবই বিমলা শুনতে পেতো বেঞ্জামিনের কাছে। এ নিয়ে অন্তত তার কথা বলার সুযোগ হ'তো বিমির সঙ্গে।

যশোর ব'লে যশোর শহর নয়। দূরেই বরং। একেবার সীমান্তের ধার ঘেঁষে। মাঝখানে খালের মতো স্থির জলের একটা নদী। কপোতাক্ষ। এপারে একদেশ ওপারে অন্যটি। এপার থেকে ওপারের মানুষকেও চিনতে পারা যায়। ওপারে, বুঝলে বিমলপ্রভা, একটা জমিদারের কাছারি আছে।

পুরনো, এখানে ওখানে ফাটল ধরা। কিন্তু এখনও রাত্রিতে জোছনা উঠলে মনে হয় দুধে স্নান করানো। ওটা কিন্তু এখন আর কাছারি ব'লে বিখ্যাত নয়। ওপারের ওটা একটা ডাকঘর।

'তুমি কি একাই যাবে?' একদিন বিমলা প্রশ্ন করেছিলো।

তখন 'তুমি' না বললে বেঞ্জামিন অসন্তুষ্ট হ'তে সুরু করেছিলো।

বেঞ্জামিন বললো, 'দু-একজন আরও যাবে। ওখানকার কর্মচারী বিবাহিত ছিলেন। সে চ'লে গেলে তার সঙ্গে তার স্ত্রীও যাবে। তার স্ত্রী ছিলো ওখানকার হসপিট্যালের মেট্রন। অবশ্য এটা আইনসঙ্গত নয়, যাজকের এই বিবাহিত হওয়াটা। কিন্তু অন্য উপায় নেই। ওরকম ছোট ছোট কেন্দ্রের জন্য ব্যাচেলার ফাদার পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ঠিক ফাদার নই। তা হ'লেও অবিবাহিত যাজক হব। হ্যাঁ, বলছিলাম, হসপিট্যালের কাজের জন্যই, এখান থেকে দু-একজন আরও যাবে।'

বেঞ্জামিনের কথা বলার ধরনই ছিলো এমনি। একটি কথা ধরিয়ে দিলে দশটা বলতো।

সেদিনই প্রার্থনা শেষে মন্দির থেকে ফিরতে ফিরতে বিমলা বললো, 'আমি হসপিট্যালের কাজ জানি।'

'সে আমি খুব বুঝতে পেরেছি। তুমি এখানকার হসপিট্যালের জন্য নিজে থেকেই যেভাবে কাজকর্ম করছ—'

'আমি যদি যশোর যাই?'

বেঞ্জামিন কি করবে খুঁজে পেলো না। মাটির দিকে চোখ রেখে ঘেমে উঠলো।

ফাদার রাজা হয়েছিলো। যশোরে রওনা হয়েছিলো বিমি বেঞ্জামিনের সঙ্গে।

স্টেশনে এটা ওটা কিনে আনায়, হাতের উপরে কাঁপা কাঁপা হাত রাখায়, বিমির তন্দ্রাতুর দেহের চারিদিকে চাদর ঠিক ক'রে দেয়ার মধ্যে বেঞ্জামিন প্রকাশ হয়ে পড়ছিলো। ভালবাসা বললে দোষ কি?

বেঞ্জামিনের বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ স্পর্শ করেছে। এতদিনকার ধৈর্যের বাঁধ তার ভাঙলো কেন? ভ্রষ্টা মেয়েরা কি পুরুষ-মনে কামনা জাগিয়ে তোলে? আর সে কি ভ্রষ্টা মনে করেছিলো বিমলাকে?

বিমি নিজেই এখন বুঝতে পারে না কেন সে হেসেছিলো না কেঁদে। সোজা

সরল প্রাণখোলা ব্যাপার নয়। তবুও হাসি। কিছুটা যেন বাধা, খানিকটা যেন গরবিনীর মতো। ষ্টীমারের বদলে নৌকা। নৌকা বাঁধা আছে সন্ধ্যার অন্ধকারে। মাঝিরা গিয়েছে কাছে এক হাটে।

'ওখানে গিয়ে।' ব'লে বিমলা একটু স'রে বসেছিলো।

বেঞ্জামিন কি বিড় বিড় করলো।

'হ্যাঁ।' এই জায়গায় বিমলা হেসেছিলো। সে কি নিজের ভাগ্যকে তখন বিদ্রূপ করেছিলো সেই হাসি দিয়ে ?

পাশাপাশি ঘরেই বন্দোবস্ত হয়েছিলো যশোরের বাংলোয়। বাংলো এক সময়ে নিদ্রায় নিঃসাড় হ'য়ে গিয়েছিলো। প্রথম রাত্রিতে বিমলা এসেছিলো নিজের জন্য পাওয়া ঘরটায়। দু'ঘরের মধ্যেকার দরজাটির একটি পাল্লা খোলা অন্যটি ভেজিয়ে রাখা। একটি ড্রেসিং টেবিলও আছে দেখছি। টেবিলের উপরে একটা দগদগে টেবিল ল্যাম্প। বিমলার ছায়া গিয়ে পড়লো পাশের ঘরে। এপাশের শুভ্র শয্যায় চোখ পড়ল তার। প্রায় নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ঘরের মধ্যে একবার পয়চারী করলো সে। তা করতে গিয়েই সে দেখতে পেলো বেঞ্জামিন মেঝেতে জানু পেতে ব'সে প্রার্থনা করছে খাটের পাশে। বিমির ছায়াটা বিছানার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেঞ্জামিনের গায়ে গিয়ে পড়েছিলো। কি প্রার্থনা করেছিলো সে ? দুটো প্রার্থনার মধ্যে সংকুচিত ক'রে রাখা এক টুকরো পাপ !

জানবার আর উপায় নেই।

কিন্তু বিমি জানতো ডাকঘরের পাশ দিয়ে নদীটা কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে।

বিকেলে সে বেঞ্জামিনকে বলেছিলো, 'চলো বেড়িয়ে আসি।'

দুজনে নদীর ধার পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলো। চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে ফিরছিলো।

বিমলা জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'এ নদীতে কি ডুব-জল আছে ?'

'ডুব-জল ? আ ছি-ছি ! একথা কেন বলছ। না হয় তুমি সময় নাও।'

'বলো না !' আদরের কাছাকাছি গিয়েছিলো বিমলার গলায় অভিনয়।

প্রগাঢ় অন্ধকারে বিকেলের চেনা পথ আন্দাজ ক'রে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলো সে। আলের পথ। পথে কাঁটাও ছিলো। পায়ের তলায় ফুটলো, ভাঙলো। তারপর নদী।

বিম্নি হাঁপাতে লাগলো। হাঁ ক'রে বাতাস নিতে গিয়ে তার দু-একটি দাঁতের আগা দেখা যেতে লাগলো।

কিন্তু অতীত তো। বোধ হয় সেজন্য সেদিন নদীর পরপারে পৌঁছে যেমনটা হয়েছিলো ততটা হাঁপাতে হ'লো না এখন।

তার চোখ পড়লো বাইরের কালো পথটার উপরে। সূর্যের আলো ম্লান হ'য়ে আসছে। সে দেখতে পেলো দু'-একজন ক'রে লোক পল্লীর দিকে আসছে। এই পল্লীর অফিস-ফেরৎ লোক। দু'-একজন স্কুল মাষ্টার, দু'চারজন অফিস-পিওন। অন্তত একজন উকিলের মুহুরী। এদের সঙ্গে সঙ্গে না হ'ক, কিছু পরে ভুবনবাবু আসবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো বিম্নির। আর একটা পুতুল ভাঙলো। কে? বেঞ্জামিন! তাকেও দয়া করা যায় নাকি? এ ভাবটা কবে থেকে হ'লো তোমার মনের? তা কি উচিত?

বেঞ্জামিনের সেই রাত্রিতে শক্তই হ'তে হয়েছিলো বিম্নিকে। ঝুঁকি নিতে হ'য়েছিলো। ইস্পাতের মত শক্ত। সেই ভালো।

ছোটবেলায় রেঙ্গুনের সেই কনভেণ্টে বিজ্ঞানের কথাও শেখানো হ'তো মুখে মুখে। সিস্টার ম্যাগি নানা রকম ম্যাজিকই যেন দেখাতো। টেবিলের উপরে জলের জগ রেখে মেঝের উপরে বিছিয়ে রাখা নল দিয়ে সে জল-চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সরু মুখ কাঁচের চোঙ দিয়ে ফোয়ারা বানানো একটা খেলা ছিলো। যেহেতু জলটা টেবিলের মত উঁচু জায়গা থেকে রওনা হয়েছিলো, মেঝের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'লেও তা উচ্ছ্রিত হ'য়ে টেবিলের উচ্চতায় পৌঁছাতে চেষ্টা করবেই, এই বোধ হয় বিজ্ঞানের সূত্রটা। কলকাতা যাবে ব'লেই বেরিয়েছিল সে। তাই যেন অনেক বাধার পরেও কলকাতার কথা মনে ছিলো তার। এই উপমায় একটা অন্ধ শক্তির কথা বলা হ'লো। এমনি অযৌক্তিক আবেগই যেন ছিলো তার। অন্তত বর্তমানে পৌঁছে তখনকার আবেগকে যেন কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যাবে না। কিন্তু মানুষ—

এসব ভাবনাই বা কেন? কি যে হয়েছে আজ সকাল থেকে।

একদিন একটা ভারি সুন্দর গল্প বলেছিলো ভুবনবাবু। নীল দাড়ি বুড়োর গল্প। অনেক টাকা তার। একের পর এক বউ মরতো তার, আর নতুন বউ ঘরে আনতো সে। টাকার মোহে আর এক মেয়ে বিয়ে করলো তাকে। ভালোই দিন যাচ্ছিলো। লোকে ভাবছিলো বুড়োর এ বউ টিঁকে যাবে।

কিন্তু কৌতূহল হ'লো মেয়ের। যে আলমারির চাবি বুড়ো কাছ ছাড়া করে না, বুড়োর অসাক্ষাতে একদিন সেই আলমারি খুললো সে। সারি সারি কঙ্কাল? পুরনো বউদের? শাস্তি পেলো, মৃত্যুও হ'লো। বুড়োর সব বউ-এরই বোধ হয় এই নিয়তি। বুকে যে কঙ্কাল আছে থাক। সে আলমারির দরজা খুলতে নেই।

'মুখ অমন নীল কেন? রুখুসুখু দেখাচ্ছে।'

'কখন এলে? এই মাত্র?'

'হ্যাঁ। অসুখ করেনি তো?'

'না।'

'চলো। ভিতরে যাই।'

ভিতরে যেতে যেতে ভুবনবাবু একবার বিমল ব'লে ডাকলো। পিঠের উপরে একখানা হাতও রাখলো যেন একবার।

আঁকড়ে ধরার মতোই বর্তমান যেন। এ রকম ইচ্ছা হ'লো অনেকক্ষণ সে গল্প করবে আজ ভুবনবাবুর ঘরে ব'সে। এর আগে একদিনই মাত্র হয়েছিলো। গল্প করতে করতে টুলে ব'সে টেবিলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সেদিন আলো ধ'রে ভুবনবাবু বিমিকে এগিয়ে দিয়েছিলো।

পটু হাতে চা ক'রে আনলো বিমি। ভুবনবাবুকে চা দিয়ে সে নিজের কাপটাও নিয়ে এলো।

'বসি একটু এখানে।'

'বসো।'

বিমি বসলে ভুবনবাবু বললো, 'মালতী তোমার ওস্তাদ মেয়ে। মস্ত শোভাযাত্রা বার করেছিলো।'

'দেখলে?'

'স্কুলের পাশ দিয়েই গেলো। ছেলেরাও হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে গেলো।'

'মাস্টার মশাইরা?'

'তারা যা ক'রে থাকে। কমনরুমে ব'সে গল্পগুজব।'

'তোমরা আবার তা পারো নাকি!'

'খুব। ইস্তক পরনিন্দা। আজ অবশ্য তা হয়নি। বউদের নিয়ে, অভাব অভিযোগ নিয়ে কথা হ'লো।'

'তোমার ও দুটোর একটিরও বালাই নেই।'

'নেই বললে বিষ নেই। আছে বললে সবই।'

'বলো নাকি সে সব?'

'কখনো কখনো বলতে হয়। যেমন আজই। ছেলেমেয়েদের কথা উঠেছিলো। কার ক'জন, তাই নিয়ে আলাপ। আমাকেও বলতে হ'লো, সে ভার বইতে হয় না।'

এক মুহূর্তের জন্য বিম্মির মনের একটা অংশ কোন এক নির্বোধকে তিরস্কার করার মতো কঠিন হ'য়ে উঠলো। পরে তার মন এক পা এক পা ক'রে পিছিয়ে এলো। তার চোখের দিকে চেয়ে এটা প্রত্যক্ষ করা যেতো। জ্বলে ওঠা মণি দুটি ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে স্বাভাবিক হ'লো যেন। অস্বচ্ছ স্বরে সে হাসলো। হেসে যেন দৃষ্টিকে পরিষ্কার করা।

'না বললে চলবে কেন?' বললো সে।

'বোধ হয় এটা ঠিক। নতুবা আমার মুখে অমন কথা আসবে কেন?'

'যাক সে কথা। একটা ভালো গল্প বলো দেখি, ভুবনবাবু, সময় কাটাই।'

'স্কুল মাস্টারের কি ভালো গল্প হয়? একপেশে হ'য়ে যায় তা অভাব অভিযোগের চাপে।'

'তোমারও তেমন হয় নাকি?'

'হ্যাঁ, না, দুই-ই বলতে পারি।' ব'লে হাসলো ভুবনবাবু।

ভালো, তবু ভালো। এই বর্তমানকে আঁকড়ে ধরা। চায়ের কাপের আঁকড়ে ধরা ভুবনবাবুর হাত। অত্যন্ত ফর্সা কিন্তু কমনীয় নয়। মসৃণ ত্বক কিন্তু হাড়ের কাঠামো বোঝা যায়। অত্যন্ত ফরসা সেই ত্বকের উপরে কালো লম্বা চিকন লোম। শিল্পীর হাত? তেমনি লম্বাটে গড়ন।

কাগজ এলো। রায়মশায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ভাগে কেনা কাগজ। রায়মশায় সারাদিন সারা দুপুর প'ড়ে ছেলেকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ভুবনবাবুর কাছে। রবিবারে এই কাগজকে কেন্দ্র ক'রে আড্ডা হয়। রায়মশায় কাগজ হাতে নিয়ে চ'লে আসে, কিংবা ভুবনবাবু যায় কাগজ পড়তে তার বাড়িতে।

ছেলেটি চ'লে গেলে কাগজ ভাঁজ ক'রে রেখে দিলো ভুবনবাবু।

বিম্মি বললো, 'পড়বে না?'

'গল্প করি বরং।'

'করব। খাওয়া দাওয়া মিটুক। সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলে।'

'আরে, আরে, এ সব কি কথা ?'

'এসব কথা বলাই স্বাভাবিক, ভুবনবাবু। বলা উচিত, ভাবা উচিত আমার। ছাই পাঁশ না ভেবে দেখা উচিত অযত্নে তোমার দেহ পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রৌঢ়ত্বের দাগ পড়েছে তোমার মুখে।'

'আরে, শোন, শোন।'

কিন্তু ততক্ষণে বিমি বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ঠং ঠং ক'রে কয়লা ভাঙছে। উনুনে তাড়াতাড়ি আঁচ দিয়ে অন্য দিনের চাইতে কিছু আগে রাত্রির আহার প্রস্তুত করবে। দিবস এবং রাত্রির দুবারের আহারের মধ্যে ভালো স্বাস্থ্যপ্রদ জলখাবারের ব্যবস্থা করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়। অন্যে করে। এরই মধ্যে তা করার চেষ্টা করে। ফলে কিন্তু তারা অভাববোধকেও বাড়িয়ে তোলে। এই পথে যেন বিমি অভাববোধকে ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু—

ভুবনবাবু দু-এক মুহূর্ত এটা-ওটা ক'রে খবরের কাগজ খুলে বসলো। একটি ধীর স্থির লোক যদি অকস্মাৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় দর্শকও কিছুটা বিচলিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে বিমি। আর তা ছাড়া, তাকে উপদেশ দেয়া ভুবনবাবুর রীতিও নয়।

॥ তিন ॥

আশা করেনি কিন্তু আশ্চর্যও হ'লো না বিমি যখন সোদামুনি দু-একদিন রই এক দুপুরে এসে ডাকলো তাকে।

'বাবু বাড়িতে?'

'না, ইস্কুলে।'

'বসি তাইলে।'

'নিশ্চয়, ব'সো।'

নিছক বেড়ানো, নিছক খানিকটা গল্পগাছা করা। তারও প্রয়োজন াছে। বুকের ভার বলো কিংবা একঘেঁয়েমি খানিকটা কেটে যায় তাতে। ার চার হাত পাশে, দু'হাত লম্বা আর সাড়ে চার হাত খাড়া তাঁবুতে যে বাস রে, অন্তত কখনও কখনও যদি তার বুকে সে কোন বোঝা অনুভব করে তা 'লে অন্যায় হয় না।

কিন্তু সোদামুনি যেন কোন নির্দিষ্ট বিষয়েই আলাপ করতে এসেছে। আর চনাটা কি করবে তাই ভাবছে।

বললো, 'মা ঠাকরুণ, আপনেও কি যাবা?'

'কোথায়?'

'দণ্ডকারন্ন। যেখানে আমাদের সকলকেই যেতে হবি।'

'না, সোদামুনি। আমি যাব না।' কোমল ক'রে বললো বিমলা।

সোদামুনি ভাবলো ব'সে ব'সে। তার মুখখানি বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর 'লো। তারপর তার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। তা ক'রে বিবর্ণতাকে যেন খানিকটা াটিয়ে উঠলো। সে সমস্যাটার অন্য দিকে গেলো।

'গেলি কি খারাপ? গেলি কি ভালো?'

'আমি তো ঠিক জানি না।'

'আমুও বুঝছি না। মাসি কয়—এ ক্যাম্প উঠায়ে দিবে দিউক, শেয়ালদায় ায়ে বসবা। তা এখান থেকে যতি উঠায়ে দিবে শেয়ালদায় বসতে দিবে কেন্?'

'তা না দিতেও পারে।'

'তাইলে?'

এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে? মালতাকে জিজ্ঞাসা করো, সে বলবে খারাপ খারাপ, বেহদ্দ খারাপ। এমন দু-একজন আছে যারা বলবে রামায়ণও পড়োনি? এমন দেশ কি আর কোথাও আছে? অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্র এখানেই গিয়েছিলেন। আর এ দুটির একটাও উত্তর নয়।

ব্যাপারটা যে সহজ নয় তা স্বীকার করাই ভালো। হলুদমোহন ক্যাম্পে যে মানুষগুলি একটা পচনশীলতার আবহাওয়ায় অনিবার্য ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের দেখলে মনে হয় একমাত্র প্রতিকারই হচ্ছে এদের অন্য কোথাও স্থাপন করা। অন্য কোথাও? কোথায় সে দেশ? বিষয়টিকে জটিল করেছে এদের একটা স্বভাবগত প্রবণতা। প্রবণতা কথাটাকেই ব্যবহার করতে হয়। কারণ তাদের এই মনোভাবটিকে যে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় সহজে তা চোখে পড়ে না। অথচ এত প্রবল সে মনোভাব যে তাকেই তাদের অন্য অনেক চিন্তার ও অনুভবের উপরে ছাপ ফেলতে দেখা যায়। কোন কোন দেশে নাকি এমন এক সম্প্রদায় আছে তারা জন্ম থেকে মৃত্যু বংশ পরম্পরায় নৌকায় বাস করে। তা করার ফলে অন্য অনেক লোকের চাইতে অনেক অসুবিধা ভোগ ক'রে থাকে কিন্তু সেই অসুবিধাগুলি যেন তাদের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। হলুদমোহন ক্যাম্পে এমন অনেক লোক আছে যাদের একটা টান আছে সেই দেশের উপরে, পদ্মা যার মহাশিরা। পদ্মার কাছে জীবিকা-নির্বাহের উপায় বাঁধা আছে, সবাই এমন কিছু জেলে নয়। পদ্মার পলি যাদের জমিকে উর্বর করবে এমন কৃষকও নয় সবাই। পদ্মা কিছুই দেয় না। বরং মাঝে মাঝে অভিশাপের মতো এগিয়ে এসে আঘাত ক'রে আবার দূরেই সরে যায়। প্রাণভয়ে এপার ওপার ক'রে আশ্রয় খোঁজে তবু কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করে। আর শুধু কি পদ্মা। পদ্মা আর তার আত্মীয় স্বজন। শাখানদী, উপনদী, কিংবা উপনদীর শাখা। পদ্মাকে না পেলে তাদের তীরেই এতটুকু স্থান ক'রে নেবার জন্য এরা আকুলি বিকুলি করছে মা তাড়িয়ে দিয়েছে, তবু যেন মা কথাটিকে ভোলা সম্ভব নয়। পদ্মা যে দেশে প্রবাহিতা সেটাই দেশ। তার বাইরে পৃথিবী আছে, দেশ নেই কিন্তু এতো শুধু বর্ণনাই। চাঁদ এবং পৃথিবীর সমুদ্রের মধ্যে কোন যোগাযোগ চোখে পড়ে না, কিন্তু কি জোয়ারই না ফুলে ফুলে ওঠে। পদ্মা আর মানুষের শিরায় ব'য়ে যাওয়া রক্ত। তাও যেন পদ্মায় মিশতে চায় তেমনি দুর্নিবার টান।

কিছুটা যেন প্রবোধ দেয়ার সুরেই বললো বিমলা, 'ওরা বলে, ভালোই হবে।'

আলাপটা এ বিষয়ে আর এগোলো না। বিমলাই অন্য কথার সূত্রপাত করলো।

'তোমার মাসি আজ কোথায়?'

'ছেইলে নিয়ে ভিখ্‌খে করতে গেলো।'

'তুমি!'

'গেলাম না। কলাম—অসুখ। ভালো লাগে না।'

'কেন? দু-একটা পয়সাওতো আসে।'

'কিন্তু—'

'টাকা পয়সা তো দরকারও—'

'ছেইলেটার কষ্ট হয়।'

'ও আর তুমি ভাবো কেন। যার ছেলে সে যদি না ভাবে।'

'তাও ভাবি। কিন্তক মন শক্ত ক'রেই মনে হয়, মা হবের জানি নাই ব'লেই অমন শক্ত হয় মন।'

কথাটা সে হঠাৎ ব'লে ফেলেছে কিন্তু বিমলাকে যেন ভাবতে হ'লো। যেন সে গভীরতাকে অনুভব করার চেষ্টা করলো।

মরণচাঁদের বউ-এর ছেলেপুলে হবে না ব'লেই মনে হয়।

সোদামুনি আবার কিছু বলার জন্যই যেন উসখুস করছে।

সে বললো, 'পরশুদিন ছেইলের পায়ে এক কাঁটা হিনে গেছিলো। পা পাততে আজ কষ্ট হতেছে। কলাম আজ নিয়ে যায়ো না। শুনলো না।'

'ওর ছেলে। তুমি ব'লেই বা কি করবে?'

'তাও ঠিক। কিন্তক, মা ঠাকরুণ, আমার একটা কথা মনে হয়। মাসির একার তো ছেইলে না। আরেকটা লোকেরও। সেই আরেকটা লোককে মাসি ভালবাসে নাই। তা বাসলি—'

'হ'তেও পারে, নাও পারে।' এই ব'লে বিমলা কথাটাকে এড়িয়ে গেলো। সে বললো, 'তোমাদের ওপাড়ার খবর কি?'

হলুদমোহন ক্যাম্পে মোটামুটি দেখতে গেলে দুটো পাড়া আছে। ক্যাম্পের কর্তার ঘরের কাছাকাছি কতগুলি তাঁবু মিলে একটা ভদ্রলোকের পাড়া। হতাশা নিঃস্বতা প্রভৃতির দিক দিয়ে ক্যাম্পের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে

তাদের ঐক্যই আছে। মানসিক কালিমাও অগভীর নয়, যদিও এদের পোশাক পরিচ্ছদ কিছুটা পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কিছু পার্থক্যও আছে। চিঠিপত্র এ অংশে কিছু বেশি যাওয়া আসা করে। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে যখন এদের কারো নামে পাঁচ দশ টাকার মনিঅর্ডার আসে কোন বদান্য আত্মীয়ের কাছ থেকে। কখনও দু'একটি ব্যাপার এরা ঘটিয়ে দেয় যাকে অর্থহীন না বলাই অযৌক্তিকতা। হলুদমোহন ক্যাম্পে একটা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। প্রায় একশ'টা বই আছে সেখানে। দৈনিক পত্রিকা রাখারও ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারটা আইনত সকলের জন্যই উন্মুক্ত কিন্তু নিরক্ষর অংশ অবশ্যই গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণ করে না।

তবে ঘরটাকে তারাও ব্যবহার করে। একবার কোথা থেকে ধর্মগুরু কিংবা কথক জাতীয় একজন এসেছিলো। বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিলো গ্রন্থাগারেই। তখন সেখানে অন্য পাড়াটির লোকেরাও অবশ্য গিয়েছিলো।

যেমন গ্রন্থাগার ক্যাম্পের চৌহদ্দির মধ্যে, খেলাধুলোর জন্য তেমনি খানিকটা খালি জায়গাও প'ড়ে আছে। দু'একটি ছেলেমেয়ে কখনও কখনও বিরস মুখে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু খেলার মতো কোন আনন্দ সেখানে দেখা যায়নি অন্তত যতদিন বিমলা সেখানে ছিলো।

কিন্তু আর এক ধরনের আনন্দের ব্যবস্থা একবার হয়েছিলো। ক্যাম্পের কর্তা অজয়বাবু করেছিলো। প্রচার বিভাগের ছবিগুলি দেখানোর বন্দোবস্ত। অস্বীকার ক'রে লাভ নেই বিমলাও গিয়েছিলো। পর্দার উপরে রাজস্থানের চাষীরা কি ফসল তুলছে, অলিম্পিকে ভারতীয় দলের খেলুড়েরা কি রকম খেলছে, তার ছবি যেমন ছিলো তেমনি ছিলো ভারতীয় আকাশবাহিনীর ছবি। আর অনেক চিত্রপটেই সুসজ্জিত পুরুষের পাশে সানগ্লাস পরা লোহিত ওষ্ঠ বরনারীরা। স্বাধীন ভারতবর্ষের উন্নতির এই প্রচারগুলি ক্যাম্পের অধিবাসীদের কাছে কোন সার্থকতার ইঙ্গিত বহন করছিলো কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। দর্শক হিসাবে তারা আনন্দই পাচ্ছিলো। পিছনের সারিতে খান কয়েক বেঞ্চে ভদ্রপাড়ার বাসিন্দারা যেমন, চত্বরে চট পেতে ব'সে নিরক্ষর পাড়ার লোকেরাও তেমনি।

অজয়বাবুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কাজটাও তার কম নয়। বন্দী-শিবিরের মতো শৃঙ্খলা নাই আনতে হ'লো। প্রায় এক হাজার লোক কাঁটা

তারের ঘেরার মধ্যে। আর মানুষগুলি বেশীর ভাগ ভাগ্যের সঙ্গে আপস ক'রে নিলেও হঠাৎ কখনও কখনও অস্থির হ'য়েও ওঠে বৈকি। পচনশীলতার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়া না-হ'ক যন্ত্রণার প্রকাশকে সীমায়িত রাখাও একটা কর্তব্য ছিলো তার।

বিমি জিজ্ঞাসা করলো, 'অজয়বাবুই তো এখন ক্যাম্পের কর্তা?'

'হ্যাঁ, সেই আছে।'

'সুরথবাবু আর তার স্ত্রী সতী?'

'তারাও আছে।'

'মোহিতবাবুর খবর কি?'

'ভালো না।'

'কেন, কি হ'লো তার?'

'বউটা ভেগে গিছে।'

'বলো কি! লতা?' এই বলতে গিয়ে বিমলা চুপ ক'রে গেলো। একি সংবাদ?

বউটার পালিয়ে যাবার ব্যাপার সোদামুনির কাছেও মুখরোচক নয়। সে বললো, 'শ্রীকান্তর কথা মনে আছে, মা ঠাকরুণ, তার একটা ছেইলে হয়েছে।'

ক্যাম্পের এপাড়া এবং ওপাড়ার আরও কিছু সংবাদ দিয়ে সোদামুনি যখন উঠি উঠি করছে, মালতী এলো। তার হাতে র‍্যাশনের ব্যাগ। চালের দাম আবার চল্লিশ ছুঁয়েছে।

সোদামুনি বললো, 'মা ঠাকরুণ, আজ যাই। খবর পালে তেনিও আসবে।'

'কে, মরণচাঁদ? বেশ তো আসতে ব'লো।'

সোদামুনির পর মালতী।

'চলো বউদি, চালটা নিয়ে আসি।'

'সে কি? ব'সো। আজ বোধ হয় আমার দিন নয় চাল আনার।'

'তা নাই বা হ'লো। ডিউ তো হয়েছে।'

মালতীর সামনে কি ক'রে বলা যায় যে সে কখনও চাল আনে না র‍্যাশনের দোকান থেকে। ভুবনবাবু আনতে দেয় না। সেটা তার মতো অবস্থায় কি মানায় বলা সত্য হ'লেও? মালতীকে খানিকটা যেন ছোটও

ক'রে দেখা হবে। আর শুধু মালতীই তো একা নয়। এ পাড়ার অনেক বউ ঝি।

'কি ভাবছো?' মালতী তাড়া দিলো।

'যেতেই হবে? চলো এমনি তোমার সঙ্গে যাই। কার্ড, টাকা এ সবই অন্য লোকের কাছে আছে।'

'তা হ'লে মিছিমিছি—' মালতী সিঁড়ি থেকে পথে নেমে দাঁড়ালো।

'যাব সত্যি। দাঁড়াও তালা দিই।'

বিমি সত্যি বেরিয়ে পড়লো দরজায় তালা দিয়ে। রোদের ঝাঁজ মাথায় নিয়ে ধুলো ওড়া পথে চলা। কিছু নয়, তবু তাতে সময় কাটে। কি হয় নিজের পুরনো কথা রোমন্থন ক'রে? তার চাইতে অনেক ভালো যে কোন ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা তা সে যত সামান্যই হ'ক। সকলেরই তা উচিত।

পল্লী থেকে বেরিয়ে উঁচু পথটায় উঠে সামান্য কিছুদূর যেতেই আলাপ করার একটা বিষয় পেয়ে গেলো তারা। একটা বাড়ি। হঠাৎ নয় বরং অনেক দিন ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে। খানিকটা কাজ হয় আবার থেমে যায়। খানিকটা তোড়জোড়, খানিকটা তারপরে ঝিমিয়ে যাওয়া। এবার যেন শেষ হ'লো। মাঝারিদের ঠিক নিচের স্তরে অবস্থান করে এমন রেলকর্মচারীদের জন্য যে রকম বাসা তৈরি হয় তেমনি যেন। তফাৎ বোধ হয় এই যে দু-একটা কাঁচের জানলা আছে। আর বাইরের দেয়ালে রং লাগানো হচ্ছে।

কিন্তু আর একটু বৈশিষ্ট্য আছে যেন বাড়িটার। দল ছাড়া ব'লে মনে হয়। শহরের শেষ বাড়ি। তার পরেই প্রান্তরটা সুরু হয়েছে, যার অধিকাংশ জুড়ে ক্যাম্প। এদিকে বাড়ি করার জন্য যারা জায়গা রেখেছে তারা বাড়ি করছে না ব'লেই বোধ হয় এটাকে এখনও একা লাগছে। এমনি সব আলাপ করতে করতে তারা বাড়িটা পার হ'য়েও গেলো। বাইরের দিকে ছোট একফালি জমি আছে। ফুলগাছ লাগানো যেতে পারতো। তা লাগানো হয়নি। একটা তেজপাতা গাছ কিন্তু বেশ সতেজ হ'য়ে বেড়ে উঠেছে। ফুলের চাইতে রান্নার উপকরণ? এ থেকে এ বাড়ির গৃহিণীর সংসারের উপরে ঝোঁকটা বোঝা যাচ্ছে?

'লোক এসেছে নাকি বাড়িতে?'

'তা এসেছে তো।'

'একদিন বেড়াতে গেলে কেমন হয়?'

'তা ভালোই হবে।'

'কিন্তু,' বললো বিমি, 'ওরা যদি কিছু মনে করে?'

মালতী এ ধরনের সূক্ষ্মতার ধার ধারে না। সে বললো, 'কি আর মনে করবে? মহিলা সমিতির সভ্য করার জন্য আমি ইতিমধ্যে আলাপ করে নিয়েছি। স্বামী-স্ত্রী। একটি ছেলে। কিছু মনে করেনি।'

বিমির লোভ হ'লো আলাপ করতে। কিন্তু সে ভাবলো—মালতী বললো বটে, কিন্তু আলাপ করার জন্যই আসা না ভেবে যদি ওরা ভাবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সে গিয়েছে?

বাড়িটার পরেই খানিকটা পতিত জমি। ক্যাম্পের প্রান্তরের প্রবর্ধিত অংশ যেন তারপর কিছুটা জঙ্গলে ঢাকা নিচু জমি। তারপরেই একটা টিনের তৈরি বড় গুদাম। পথের অন্য পারে মালতীদের পল্লী শেষ হ'তেই চাষের জমি। তারপরেই শহরের বস্তি-অঞ্চল সুরু। বস্তির ভিতরে একটা সরু গলির মুখে ছগনলালের মডিফায়েড র‍্যাশন শপ।

দোকানটার কাছাকাছি একটা কল আছে পথের ধারে। কে খুলে রেখে গেছে, অকারণে জল পড়ছে।

মালতী বললো, 'এখানে জল নষ্ট হয়। আর একটু গিয়ে আমাদের পল্লীতে কল বসালেই এদের নাকি জলের দম ফুরিয়ে যায়।'

'লাইন বসাতে টাকাও তো লাগে।'

'তা তো বলে না। উদ্বাস্তুদের অফিসে গেলে বলে টাকা নেই, তবে টাকা হয়তো দেয়া যায়। কিন্তু জলওয়ালারা বলে অতদূরে পাইপ নিলে জলের জোর ক'মে যাবে।'

'এত খবরও রাখো তুমি!'

ফিরবার পথে বিমি বললো, 'মালতী, ক্যাম্পের লোকদের নিয়ে তুমি শোভাযাত্রা করলে, ওদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'হলো বৈ কি! দু-চার জনকে আগেও চিনতাম।'

'আগেও চিনতে?'

'ওখানে যখন ছিলাম আমরা তখনও ছিলো এমন কয়েকজন এখনও আছে ক্যাম্পে।'

'ক্যাম্প থেকেই কি এই পল্লীতে?'

'হ্যাঁ। পঞ্চাশে। সরকার থেকেই প্লট ভাগ ক'রে ক'রে আমাদের বাড়ি

করার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো। আমরা যখন ছিলাম তখন ক্যাম্পের কর্তা ছিলো সুরেন বাবু। অজয় বাবু এসেছে পরে। ক্যাম্পের কথা আর তোমাকে কি বলবো। এ পল্লীতে বাস ক'রেই তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ। ক্যাম্প যে কি ব্যাপার। লাজলজ্জা ব'লে কিছু থাকে না।'

বিমির মুখ যেন মালতীর কথা শুনেই বিবর্ণ হ'য়ে গেলো। ও ভয়টা যে কেন তার যাচ্ছে না। ভয়? ভয় বললে যেন অনুভবটাকে গণ্ডিবদ্ধ ক'রে দেয়া হয়। একথা সত্য নয় যে মালতী জানলে ক্ষতি হবে যে বিমলাও একদিন ক্যাম্পে বাস করেছে। কিন্তু মালতী যেন কঙ্কাল সাজিয়ে রাখা সেই আলমারির দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে।

মালতী বললো, 'মোহিতবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলো। সেদিন দেখলাম এখনও আছে। আমরা আসার দু-এক মাস আগে এসেছিলো। উনপঞ্চাশ থেকে উনষাট। ক বছর হয়।'

'তা হ'লো।'

'জানো বউদি', মালতী বললো, 'আমরা মোহিতবাবুকে দেখতে পারতাম না। ওর দিকে পক্ষপাত করতো সুরেনবাবু। তখন ছোট ছিলাম। বড়োদের মনের ভাব অন্য রকম ছিলো। তারাও দেখতে পারতো না। মোহিতবাবু আর তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাপ করতো। ঢলানি কথাটা আমি তখনই শিখে ফেলেছিলাম। আমার এখন মনে হয় মোহিতবাবুর ওটা স্ত্রী ছিলো না অন্য কারো—।'

পল্লীর কাছে এসে পড়েছিলো তারা। বিমি বললো, 'এর পর থেকে র‍্যাশন আনার দিনে ডাক দিও। কাজটাও হ'য়ে যাবে। বেড়ানোও হবে।'

মালতী বললো, 'পুরুষদের একটু সাহায্যও হয়। কিন্তু মজা দেখ, সেই তেতাল্লিশে সুরু হয়েছে র‍্যাশন। কত কি হ'য়ে গেলো। যুদ্ধ ছিলো, তা মিটলো। দেশ ছিলো, দু'ভাগ হ'লো। পরাধীন থেকে স্বাধীন। মানুষ নাকি এখন উপগ্রহ তৈরি করছে। আমরা সেই থলি নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকলাম।'

'এ তোমার রাজনীতি।'

মালতী তার বাড়ির দিকে চ'লে গেলো।

এবার বিমি তার সংসারের কাজকর্ম করবে। ভুবনবাবুর ঘর গোছাবে আজ। ভুবনবাবু আসবার আগেই কাজটা সেরে নিতে হ'লে খুব তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হবে। চিন্তাভাবনার সময় পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ঝাঁটা দিয়ে ঘরের দেয়াল ঝাড়া শেষ ক'রে ভুবনবাবুর টেবিলে হাত দিয়ে বিমির মনে পড়লো মোহিতবাবুর কথা।

ওই ক্যাম্প একটা স্মৃতির ঝাঁপিও বটে। তার পাশে কখনও কখনও তুমি উদাস হ'য়ে ব'সে থাকো। অন্য কখনও ঝাঁপিটা তোমাকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

ভদ্রলোক এক সময়ে খুব সুপুরুষ ছিলো—মোহিতবাবু। কিন্তু মালতীর ভাষায় উনপঞ্চাশ থেকে উনষাট ক্যাম্পে বাস ক'রে এখন তাকে বিবর্ণ হলুদ দেখায়। বউটি রূপবতী ছিলো। শেষ যখন লতাকে দেখেছে বিমি তখনও তাকে রূপবতী মনে হ'তো। বিমলার তাঁবুর তিনখানা তাঁবু পরে ওদের তাঁবু ছিলো। ওদের তাঁবুর বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমন তাঁবুর একদিক চৌকোনা ক'রে কেটে একটা জানলা করেছিলো। আর তাঁবুর ভিতরে এক হাত উঁচু একটা চৌকি পেতে তার উপরে বিছানা করতো। তাঁবুর অন্যদিকে টিপয়ের মতো একটা ছোট টেবিল পেতে আয়না চিরুনি টুকি-টাকি গুছিয়ে রাখতো। ওদের তাঁবুতে ওরা বোধ হয় ধূপও দিতো।

কিন্তু ক্যাম্পের লোকেরা যে ওদের দেখতে পারতো না ক্যাম্পে আসবার এক সপ্তাহের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলো বিমলা। সন্ধ্যার দিকে অকস্মাৎ কোন তাঁবু থেকে কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে বেরিয়ে প'ড়ে কুৎসিত ভাষায় কাকে গাল দিতে সুরু করলো। বিশেষণগুলি শুনে বোঝা যায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি স্ত্রীলোক। নিজের তাঁবুতে ব'সে বিমলা তখন ভাবছিলো এর চাইতে মরণ-চাঁদের তাঁবুর কাছাকাছি তার তাঁবুটা হ'লেই ভালো ছিলো। ক্যাম্পের কর্তা তাকে দয়া করে এদিকে আশ্রয় না দিলেই ভালো করতো। দয়াই বলতে হয় অজয়ের। পরে একদিন সে বলেছিলো—আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম মরণচাঁদ এবং আপনি এক দলের হ'লেও এক শ্রেণীর নয়। আইনে না থাকলেও ক্যাম্পে যখন দুটো পাড়া তৈরি হয়েছে তখন আপনি এ পাড়াতেই থাকুন।

তিরস্কারের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে চিনতে দেরি হ'লো না। কলঙ্কের দিক দিয়েই তারা প্রাধান্য পেয়েছিলো। তা না হ'লেও তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। রূপ ও বেশভূষা নয় শুধু। তারা স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তায় এমন একটা সুমার্জিত পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দিতো যে তাদের অগ্রাহ্য করা যেতো না। কিংবা কলঙ্ক ও সুমার্জিত পরিবেশ এই দু'য়ে মিলেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার শক্তি।

এক রাত্রির প্রথম প্রহরে আবার কলহ সুরু হ'লো। বিমলার পাশের তাঁবুর গুহগিন্নী সেই কলহের মধ্যে বিমলাকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। এসো না, এসো, দেখ'সে।

মোহিতবাবুর তাঁবুর দরজা ফেলে দেয়া ছিলো। নিজের হাতে তুললো তা গুহগিন্নী তাঁ বুর মধ্যে বিছানায় শুয়ে একটা মৃদু আলোকে টেবিল-ল্যাম্পে বই পড়ছে মোহিতবাবু। আর লতা তার ছোট টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা মাত্র মোমের আলোয় যেন বেড়িয়ে এসে পোশাক ছাড়ছে।

গুহগিন্নী ফেটে পড়লো, 'মাফলারটা কোথায় পেলে?'

'মাফলার, ও হ্যাঁ মাফলার।' লতা নিজের গলায় হাত রাখলো। সেখানে একটা চকচকে নতুন মাফলার জড়ানো।

বিমলা পিছিয়ে যাবে কিনা বুঝতে না-পেরে গুহগিন্নীর পিছনে আত্মগোপন ক'রে রইলো।

'কোথায় পেলে তাই বলো না। তোমার ওটা?' গুহগিন্নী ফুঁসে উঠলো।

'আমার গলায় রয়েছে দেখছেন।'

'তা দেখছি। এতক্ষণ কোথায় ছিলে তাও দেখেছি। বিকেল থেকে এই রাত আটটা পর্যন্ত শূন্য মাঠে তোমাদের পায়চারি করা শেষ হ'তে আর চায় না।'

'কি বলছেন যা তা।'

'যা তা? ক্যাম্প শুদ্ধ লোক দেখেনি? ও মাফলার তোমার?'

'আমার নয়?'

'একশ' বার নয়। কালকের ডাকে এসেছে। ওর দিদি পাঠিয়েছে নিজের হাতে বুনে। খোকার মাফলার। বাগিয়ে নাওনি খোকার কাছ থেকে? ছেলেটার মাথা চিবোওনি সারা সন্ধ্যা?'

'শেকল দিয়ে ছেলেকে সামলালে পারেন।'

'ছেলেকে আটকে রাখব? বেহায়া মেয়েমানুষ।'

দপ ক'রে চোখ জ্ব'লে উঠলো লতার। সে বললো দাঁতে দাঁত চেপে, 'গাল দেবেন না বলছি।'

'দেব না? একশ'বার দেব।' রাগের দমকে গুহগিন্নী হাঁপাতে লাগলো।

লতা মাফলারটা গলা থেকে খুলে হাতে নিয়েছিলো। গুহগিন্নীর দিকে

ছুঁড়ে দিলো। পৌঁছুলো না সেটা। তখন পা দিয়ে ফেলে দিলো দরজার দিকে গুহগিন্নীর প্রায় গায়ের উপরে।

'নিয়ে গিয়ে পরিয়ে দেবেন ছেলেকে। পৌরুষ বাড়বে তার।'

গুহগিন্নী দ্বিধা করলো কিন্তু মাফলারটা কুড়িয়ে নিতে পারলো না।

ওদের তাঁবুর পাশ দিয়ে চ'লে আসতে আসতে বিমলা শুনতে পেয়েছিলো। অত রাগের মাথায় গুহগিন্নী বোধ হয় শুনতে পায়নি।

মোহিত বলছিলো, অনেক দূরের যেন কণ্ঠস্বর, 'লতু, কাঁদছ নাকি?'

'না।'

'ও আমার দরকার কে বললো তোমাকে?'

লতা সাড়া দিলো না।

বিমলা নিজের তাঁবুতে ফিরে হতবাক হ'য়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় ক্যাম্পের দু'নম্বর কলে জল আনতে গিয়ে লতার সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো। বিকেল থেকে কয়েকবার চেষ্টা ক'রে ভিড়ের জন্য পারেনি এগোতে। ভিড়টা নেই এখন। সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় দূর থেকেই বোঝা যায় লোক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু চেনা যায় না। দু'জন লোক ছিলো কলতলায়। পুরুষটি কল চালাচ্ছে আর মেয়েটি বালতি ক'রে জল ধ'রে কাপড় ধুচ্ছে।

বিমলা কলের কাছাকাছি যেতে হঠাৎ পুরুষটি স'রে গেলো।

বিমলা দেখতে পেলো কলতলায় লতা। কাপড়গুলো চিপে এক বালতি জল নিয়ে লতা স'রে দাঁড়ালো কল থেকে।

বিমলাকে দেখে সে বললো, 'নতুন এসেছেন বুঝি? কালকে কি আপনিই ছিলেন গুহগিন্নীর পিছনে?'

বিমলা হ্যাঁ কিংবা না বলা উচিত এই ভাবতে লাগলো। কিন্তু লতার কণ্ঠস্বর তার ভারি ভালো লেগেছিলো। তার চাইতেও ভালো বোধ হয় তার উচ্চারণ।

চ'লে যাবার জন্য দু-এক পা এগিয়ে হঠাৎ লতা থামলো। মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'কলতলায় পুরুষটিকে চিনেছেন? গুহগিন্নীর স্বামী—গুহ মশাই।'

সেদিন কি মনে হয়েছিলো বিমলার আজ তা মনে নেই। কিন্তু একথা সত্য লতাকে সে কখনও ভুলতে পারবে না।

আর মোহিতবাবু?

মানুষ কোথায় নামে দেখ, এ বলার সাহস তখন বিমলার ছিলো না। এখনও? তখন সে ভাবতো তা সত্ত্বেও মোহিতকে কি লতা ভালবাসে? মনে মনে সে একটা গল্প তৈরি করেছিলো। মোহিতবাবু যেন খুব বড়ো ঘরের কোন ছেলে। লতাকে ভালবেসে সে হয়তো বাপ মার রোষে পড়েছে। হয়তো বা সহায়-সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত। তাই লতা তার সুখের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য কারো মাথা চিবিয়ে খায়। তা হ'লেও মোহিতবাবুর অমন মেজাজি চালে শুয়ে শুয়ে বই পড়ারই কি সার্থকতা? বই পড়তো বটে সে। লাইব্রেরিটা স্থাপনের মূলে মোহিতবাবুই ছিলো।

শ্রীকান্তর কথাও বলেছে সোদামুনি। তাদের লাইনেই দু'খানা তাঁবুর পরে থাকতো তখন শ্রীকান্ত আর তার স্ত্রী বিন্দা।

কেই বা কার খোঁজ রাখে যদি খোঁজ করার মতো ব্যাপার না ঘটে?

সময়টা দুপুর। সব তাঁবুতেই তখন আহারের সময়। রান্না শেষ ক'রে বিমলা জিরিয়ে নিচ্ছিলো। হঠাৎ হাঁকাহাঁকি মারপিটের মতো শোনা গেলো।

তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলো গোলমালটা মরণচাঁদের তাঁবুর দিক থেকেই আসছে। মরণচাঁদ সহজে রাগ করে না কিন্তু রাগ করলে থামতে জানে না। কিন্তু তাকে শান্ত করার জন্য এগোনা দুঃসাধ্য, সবগুলি তাঁবু থেকে পুরুষরা হৈ হৈ ক'রে ছুটছে। আর মরণচাঁদের তাঁবুর কাছে গিয়ে বিমি দেখতে পেলো নিজের তাঁবুর দরজায় ব'সে মরণচাঁদ নির্বিকার মুখে হুঁকো টানছে। সুখদুঃখের ঝড় জলের বিপদ বিড়ম্বনার সাথী হুঁকো।

সন্ধ্যাবেলায় মরণচাঁদ এসে বললো, 'মা ঠাকরুণ, বসতে আসলাম।'

'বসোসে।'

'দুপুরে গোলমাল হ'লো। বিন্দার স্বামী আসছিলো।'

'তাতে কি হ'লো?'

'শ্রীকান্ত না, আর একজন।'

'সে কি! বলো কি?'

শুধু বিমলাই বা কেন, কে বিস্মিত হয়নি? নাকে নোলক পরা দেখতে একেবারে ছেলেমানুষ সেই বিন্দার এত কথা। পরে সারা ক্যাম্পেই গল্পটা ছড়িয়ে পড়েছিলো। কৃষকের মেয়ে বিন্দা, সমান ঘরেই বিয়ে হয়েছিলো তার, শুধু শ্রীকান্ত বয়সের দিকে একটু বেমানান। স্বগ্রামের এক যুবক অগ্নিকুমার।

নমশূদ্র সম্প্রদায়ের, সে দিক দিয়ে শ্রীকান্তদের সদ্‌গোপ শ্রেণীর বাইরে। অগ্নি-কুমার কলকাতায় চাকরি করে। কি থেকে কি হ'য়ে গেলো। দু-বছর পরে হঠাৎ আবার বিন্দাকে পেলো শ্রীকান্ত। কাশি রোগ হয়েছে তখন বিন্দার। গ্রামের রেল স্টেশনে নেমে সে আর চলতে পারছিলো না। শ্রীকান্ত তাকে ঘরে রাখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার সম্প্রদায় বললো—হাসপাতালে যাক কিংবা ভাগাড়ে। নমশূদ্রর উচ্ছিষ্ট না? কাশি সারলো বিন্দার। হয়তো সে সংসারে মন দিতো। কিন্তু গায়ে তার দাগ প'ড়ে গিয়েছিলো যেন, প'চে গিয়ে মাছি আকর্ষণ করছে। দুশ্চরিত্র লোকেরা উৎপাত সুরু করলো। এক দিন ভেসে পড়লো শ্রীকান্ত বিন্দাকে নিয়ে।

কিন্তু সেদিন এসব জানা ছিলো না। আর অগ্নিকুমার এসে দাবি জানায়নি শুধু, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের একখানা কাগজ সে মেলে ধরেছিলো। পক্ষান্তরে শ্রীকান্ত? তার বিয়ের সাক্ষী যারা, কুষ্টিয়ার সে লোকেরা কোথায় কে জানে? কিছুই সে বলতে পারছিলো না। এমন কি বিন্দার ইতিহাসও নয়। কেউ কি বলতে পারে সকলের সামনে স্ত্রীর দুর্বলতার কথা।

তখন অজয়বাবু এসেছিলো। সব সময় না হ'লে কখনো কখনো সে দেবতার মতোই অবতীর্ণ হ'তো মঞ্চে। অজয়বাবু অগ্নিকুমারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো কারণ অগ্নিকুমারের মুখ থেকে তখনও নাকি মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো। আর বিন্দাকে হুকুম করেছিলো শ্রীকান্তর তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে। সত্যই বিন্দা একটা পৃথক তাঁবু পেয়েছিলো। পুরনোই। ছোট তাঁবুগুলোর চাইতেও ছোট।

সেই শ্রীকান্তদের ছেলে হয়েছে।

দুটি ছবি পাশাপাশি বিরাজ করতে লাগলো বিমলার মনে। মোহিতবাবু এবং লতার ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেছে, পক্ষান্তরে শ্রীকান্ত এবং বিন্দা আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে! এ যেন কারো কূল হারানো, অন্য কারো তখন কূল পাওয়া। তাই কি?

শ্রীকান্ত অত্যন্ত লম্বা ব'লে তাকে রোগা দেখায়। মাথার চুলগুলি প্রায়ই পাকা ব'লে বুড়ো দেখায়। ঠিক কোথায় দলে এসে ভিড়েছিলো তা মনে পড়ে না। হলুদমোহন ক্যাম্পে মরণচাঁদের দল যখন পৌঁছালো সে দলে শ্রীকান্ত এবং বিন্দাও ছিলো। একটা প্রমাণ মনে পড়ছে, হলুদমোহন ক্যাম্পে পৌঁছানোর শেষ দু-মাইল পথ যারা অসুস্থ বিমলাকে বহন করেছিলো তাদের মধ্যে মরণচাঁদের সঙ্গে শ্রীকান্তও ছিলো।

শ্রীকান্ত আর মরণচাঁদ। বিশেষ ক'রে মরণচাঁদ।

দেখা হয়েছিলো বনগাঁ রেল স্টেশনে। কপোতাক্ষ পার হ'য়ে তিনদিন তিনরাত্রির চেষ্টায় বনগাঁ। অজানা পথ। পথের কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিলো না। আহার্য সংগ্রহের উপায় ছিলো না। প্রথম দিন কেউ কেউ গায়ে প'ড়ে কথা বলতে এসেছে। দ্বিতীয় দিনে অনেকটা ধূলি-মলিন হ'য়ে পড়েছিলো সে। আর যাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় সে জন্য সে এক ঝোপের আড়ালে ব'সে শাড়ির রঙান পাড়টা ছিঁড়ে ফেলেছিলো। তার ফলে পায়ে পায়ে লেগে শাড়িটা ফালা ফালা হ'য়ে ছিঁড়েছে, গিট দিতে হয়েছে। তৃতীয় দিনের সকালে প্রথম লোকটাই পাগলী বলেছিলো।

বনগাঁ রেল স্টেশনে লোহার বেড়া ঘেঁষে অন্তত হাজার লোক। ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, কালি পড়া হাঁড়িকুড়ি, দড়ি দিয়ে বাঁধা, জড়ানো, মলিন মাদুর কাঁথা। রুগ্ন, অভুক্ত, অস্নাত, হাজার লোকের পূতিগন্ধ জনতা।

বিমলাও মাটিতে ব'সে পড়েছিলো। তাদের আলাপ শুনতে পাচ্ছিলো সে। কিন্তু অর্থবোধ হচ্ছিলো না সব সময়ে।

একটি দাড়িগোঁফ কামানো স্বাস্থ্যবান পুরুষ। এক হাতে হুঁকো, অন্য হাতে ধরা কল্কে। আগুনে ফুঁ দিতে দিতে পাশ থেকে সে বলেছিলো:

'যাওয়া হবি কনে?'

'কলকাতা।'

'সকলেই তো তা যায়। যা শুনি তা ভালো না।'

এরপরেই বোধ হয় জ্বরে বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছিলো বিমলা।

তখন চারিদিক অন্ধকার। চোখ চেয়ে বিমলা ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিলো।

'আঃ হা, হ'লে কি?' পাশ থেকে কে বললো।

অন্ধকারের প্রথম আচমকা স্পর্শে সে ফুঁপিয়ে উঠেছিলো। এবার স্টেশনের মিটমিটে আলোয় সে দেখলো সকালের দিকের জনতা এখন অনেকটা ক'মে গেছে।

'হ'লে কি?' পাশের লোকটা প্রশ্ন করলো আবার। উত্তর না পেয়ে কাউকে বললো, 'হুকোটা কই। কাজের সময় হুঁকো পাই না। কর কি, সোদামুনি?'

লোকটি হুঁকো পেয়ে কল্কেতে আগুন জ্বাললো, তারপর হুঁকো হাতে এগিয়ে এলো।

'আপনি যাননি ?' বিমলা প্রশ্ন করলো।

'গেছে, অনেকেই গেছে। আমার আবার লটবহর অনেক। গাড়িতে উঠবের পারি নাই।' লোকটি বললো।

'আমাকে ফেলে যাবেন না।'

'আঃ হা। তা যাইও নাই। অ সোদামুনি, দেখতো গায়ে হাত দিয়ে, জ্বর নাকি ?'

সোদামুনি উঠে এসে বিমলার গায়ে হাত রেখেছিলো, 'জ্বর তো। তাই ব'লে কি এই জ্বরের রোগীর জন্যে রাতের গাড়িতেও ওঠা বন্ধ করবা নাকি ?'

'আঃ হা।' হুঁকো টানার শব্দ হ'তে লাগলো।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙেছিলো বিমলার। সে অনুভব করলো মাথার তলায় তার বালিশের মতো কিছু। সে বোধ হয় মাদুরে শুয়ে আছে, গায়ের উপরে কাঁথাও বোধ হয়।

এই লোকটি মরণচাঁদ। এখন আর কথায় কথায় আঃ হা বলে না। ভাষার পরিবর্তন হয়েছে তার। হুঁকোটা আছে। বোধ হয় বুকের জোর ক'মে গেছে ব'লে তেমন আর মজা পায় না, বারে কমে গেছে।

দিনের গাড়িতে ওঠা হয়নি, রাতের গাড়িও চ'লে গিয়েছিলো।

ঝাড়ুদারের ঝাঁটা থেকে ছিটকে আসা পাথরের কুচি গায়ে লাগতে উঠে বসলো বিমলা। শুনতে পেলো মরণচাঁদ বলছে, 'আরে ঝাড়ুদার ভাইয়া, উধারসে কাহে নাহি ঝাড়তে পারতা।'

অবশ্য জ্বর ত্যাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলেনি।

জ্বর কমতেই মরণচাঁদ এসে বলেছিলো, 'মা ঠাকরুণ, আজ গা তোলা লাগবি।'

'কলকাতায় যাবেন ?'

'দেখি তো।'

এখানে একটু হাসি পেয়ে যায় বিমলার। আলাপটা সে শুনে ফেলেছিলো।

'মা ঠাকরুণ যখন কইছি মনে মনে গর্ভধারিণী মানছি। তা তোমাকে কলাম, সোদামুনি।'

'আমি কি তাই কইছি ?'

'কও নাই। ক'বের পারো। মনে হতি পারে তোমার।'

'তা করবো কেন? যতি মনেই হয় তুমি অন্য ধরছো, ডুবে মরবো না গাঙে?'

'গাঙ তুমি কনে পাবা সোদামুনি সোনা, এদেশে কি ডুবে মরার গাঙ আছে?'

দাম্পত্য আলাপ।

কলকাতায় যাওয়া হয়নি। মরণচাঁদের দলের একজন হ'য়েই তার দিন্ কেটেছে হলুদমোহন ক্যাম্পে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত।

মরণচাঁদ একটা যুক্তি দিতে পারে, না যাওয়ার। কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই এক স্টেশনে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তার।

'মোত্দা খবর কি? ইস্টিশানে কি করো। তুমি না কলকাতায়?'

'নামের কেতাই সার, মানুষ নাই।' মোতি বললো।

'কি কও, বুঝি না।'

'নামো। বুঝায়ে কই।'

'গাড়ি ছাড়ে দিবি।'

'খালি গাড়ি যাক। যায়েও কি নরক!'

নামো, নামো। সব সমেত পাঁচ সাতজন মানুষ, তাদের মধ্যে বিমলাও ছিলো। হুড়মুড় ক'রে লটবহর নিয়ে, অন্য যাত্রীদের গালাগালি ধাকা-ধাকির মধ্যে নেমে পড়লো।

'তারপর, মোত্দা?'

'শিয়ালদহার ইস্টিশানে তিন মাস।'

'ইস্টিশানে। বেশ তো, তারপর?'

'এমনি তো গন্ধে গা গুঁটায়। মানুষ পচা ধরেছে।'

'হুঁ। হু কোটা কই, সোদামুনি, তার বাদে?'

'মায়ের দয়া লাগছে। ইস্টিশানে লোক মরতেছে। লোকের গায়ে সাদা গুড়া ছিটায়ে দিতেছে।'

'বাব্বা।'

খুব বেঁচে গেছে এই রকম ভাব দেখিয়ে মরণচাঁদ লটবহরগুলি স্টেশনের বেড়ার দিকে সরিয়ে সরিয়ে রাখতে লাগলো।

একবার তার মধ্যেই খোঁজ করেছিলো, 'মা ঠাকরুণ, আছে, না গেছে।'

নিজে সে কেন কলকাতায় গেলো না? কলকাতায় যাওয়ার গতিবেগ সঞ্চিত ছিলো সে হাউইএর সব বারুদ পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থাই কি হয়েছিলো তার? বাস্তুহারাদের মধ্যেও চমকপ্রদ বাস্তুহারা সে। শোবার মাদুরটাও নেই, পরণের খানা ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। মরণচাঁদের দলের যে কেউ সম্বলের দিক দিয়ে তার চাইতে ধনী। মনে হয়েছিলো তার বার বার সে আর মানুষ নেই ভৈরবের ঘটনার পর। একটি নারীর প্রেত, প্রতিহিংসা নেবার মনোভাবই যার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা হ'তে পারে।...কি হবে আর কলকাতায় গিয়ে। বলা যাবে বন্ধুকে? সারা জীবন তারপর কৃপাদৃষ্টির ছোবল খেয়ে বেড়াতে হবে না? কিন্তু এ সব যুক্তিই বোধ হয় পরে সংগ্রহ করা। তখন বোধ হয় নিচের দিকে টান লেগেছিলো। নিচের গড়ানে দিকটাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব'লে বোধ হয়েছিলো। এই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কি দুঃসহ বেদনাই তাকে অনুভব করতে হয়েছিলো তখন।

প্রায় এক বছর লেগেছিলো পথে পথে ঘুরে অবশেষে হলুদমোহন ক্যাম্পে পৌঁছুতে। সে সময়ে একদিন মরণচাঁদ বলেছিলো শ্রীকান্তকে, 'বুঝলা কান্ত, আমার জেঠা মাঠ চষতে যায়ে এক ঠাকুর পাছিলো। তার একখানা পা ভাঙা। গাঁয়ের লোকে কয় ও পূজা হয় না। জেঠা বলে এক পা আছে তার ধুলাতেই তরাবি। বুঝলা না কান্ত, সেবার কলকেতা থেকে এক বাবু আসলো। জেঠার তখন অভাব। ধান ওঠার দেরি আছে। ঠাকুর দেখে বাবু কয়—কিনবো। দাম? নিষ্পত্তি হ'লে ন্যায্য একশ' এক। জেঠা কি দাম জানতো? তা না। বুঝতো গাহাক কি দূর যাবি বুঝলা না। তা আমারও এক মা ঠাকরুণ কুড়ায়ে পাওয়া হয়েছে। হুঁকোটা কই, অ সোদামুনি। আই।'

সোদামুনি হুঁকো এগিয়ে দেয় না কারণ সেটা মরণচাঁদের হাতেই ছিলো। বরং কথা এগিয়ে দিলো। বললো সে, 'তুমিও কি মা ঠাকরুণ বেচবা?'

'থাম। মিয়েমানসের বুদ্ধি।' তারপর আশ্চর্য রকম স্থির হ'য়ে ভাবলো মরণচাঁদ। বললো, 'তা যদি তেমন গাহাক পাই কোন কালে। জেঠা যদি গাহাক চিনে থাকে আমুও চিনবো।'

সেদিন মরণচাঁদের মন ভালো ছিলো। হিরণ ভিক্ষা করতে বেরিয়ে খবর এনেছিলো আর বিমলা নিজেই তা সমর্থন করেছিলো, সেও দেখে এসেছে। একটা জবরদখল কলোনির পিছনে জঙ্গল ঢাকা বিস্তৃত একটা ডোবা। জঙ্গল কাটিয়ে নিলে ডোবাটার তিনদিকে বসা যায়। কারণ চতুর্থ দিকে রেলের

লাইন। লাইন ছাড়িয়েও খানিকটা জমি সেখানে রেলের খাতিরেই ছেড়ে দিতে হবে। জঙ্গল কাটলে বাসাও বানানো যাবে। জবরদখল কলোনির ধার ঘেঁসে কলোনির বস্তি-সামিল হ'য়েই বসা যেতে পারবে।

পথে আসতে আসতে হিরণ বলেছিলো, 'গাঁ উদিকে। তুলে দিতে আসে উদিকে চোট পড়বে। আমরা একেবারে পিছনে। ওরা ওঠে, আমরাও ঝাঁক বাঁধব। না ওঠে, আমাদেরও কেউ তুলবে না ডোবা থেকে।'

ডোবা আর জঙ্গল। আরে, সে জন্যেই প'ড়ে আছে। না হ'লে এতদিন অন্য কেউ বসতো না। এখন শীতকাল। ডোবায় জল যদি থাকে লোকসানের নয়, লাভের। বর্ষায়? সে তখন দেখা যাবে। ডোবার ভিতরে তো বসছি না। কিনারে জল উঠতে কিছু দেরি হবে। আর কয় মাসই বা বর্ষা? বিকেলের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব নিয়ে আলাপ হ'য়ে গেছে মরণচাঁদের দলে।

কাল সকালে সকলে মিলে জঙ্গল কাটবে। মেয়েরা বেড়া বাঁধবে জঙ্গল কুড়িয়ে। ছেলেরাও সাহায্য করবে। আর মা ঠাকরুণ, তারও কাজ আছে। সকলের জন্য রান্না করবে। বেলা ডুবলে সারা দিনমানের একবার খাওয়া। যাদের ছেইলেপুলে কাঁদবে তারা যেন চিড়েমুড়ি যোগাড় ক'রে রাখে। ঘর তুলে ঘরে ব'সে তবে হাঁপ ছাড়া। ঘর না উঠলে রাতে ঘুমানো নাই। হুকুমগুলো মরণচাঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো, কিন্তু হুকুম নয় যেন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব।

তখনও প্রায় রাতই আছে, ডোবার ধারে গিয়ে পৌঁছেছিলো মরণচাঁদের দল। হাতে দা কাটারি হেঁসো। সে জঙ্গলে সব চাইতে বড়ো গাছ খেজুর আর বাবলা। তার চারিদিকে ঘেঁটু। তাও প্রায় কোমর সমান। ঘেঁটুর ডালপালায় বেড়া হবে। হিরণ বললো, আর বাবলা কেউ যেন না কাটে। সে-ই দেখে শুনে কাটবে। পাঁচটি পরিবারের ছ'টি ঘর উঠবে। ছ-এর নম্বর মা ঠাকরুণের, যদিও সে মরণচাঁদের পরিবারেরই একজন। খেজুরের পাতায় ছাউনি হবে। বললো একজন। হিরণ বললো—চায়ে দেখ, ঘেঁটুর পরেই কাশা। আর ওকি হোগলার মতো দেখায়? বড়ো ঘর হবে না। চার হাত খাড়াই। আট হাত বাই ছ' হাত। দোচালা না, একচালা। বড়োরা ঘেঁটুর জঙ্গল কাটা শেষ ক'রে হিরণের খবরদারিতে বড়ো বাবলার ডাল, ছোট বাবলা গাছ সমেত কাটছে ঘরের খোঁটা তীর বরগার জন্য। মেয়েরা বাবলার ডাল মাটিতে বিছিয়ে বেড়া বাঁধবার যোগাড় করছে।

সন্ধ্যায় চারখানা ঘর শেষ হ'লো। সবুজ রং হলো ঘরের। উপকরণের রং। চারখানা ঘরে পাঁচটি পরিবার আশ্রয় নিলো। হিরণ বলেছিলো বাঁশ থাকলে ছ-খানাই উঠতো। আঁকা বাঁকা বাবলার ডালে কি চৌরস কিছু হয়! কিন্তক খবরদার। বাঁধন দড়ি হোগলার। কাল যদি রশি কিনে বাঁধা-ছাঁদা না করো এক বাতাসেই মাটি-সই।

তারপর দিন আর দুখানা ঘর উঠলো। ঘর উঠলো, থাকবে। খাবে কি? ভিক্ষা। কদিন ভিক্ষা পাবে। সব লোক যখন চিনে ফেলবে তখন? ওরা তো বসেছে আমাদের আগে। ওরা কি করে? জেনে নিতে হবে অনুনয় বিনয় ক'রে। ওরা না-উঠবে ব'লেই তো তোমরা বসছো। ওরা খেলেই তোমরা খাবে। নতুন বাড়ি তুলে চিন্তায় ঔদার্য এসেছিলো।

কিন্তু একদিন জমির মালিক দেখা দিলো। ওপাড়ায় ঢেঁড়া পিটে ব'লে গেলো আগামী বিষ্যুদবারে উঠে যেতে হবে। সব। কেউ থাকবে না। জমির মালিক কে? সে যেই হ'ক। শুক্রবারেও যে থাকবে সে বুঝবে। ঘোষণা নয়, শাসানি। ওপাড়ার খবর এপাড়ায় আসার কথা নয়। কিন্তু এলো। এলো বছর আঠারো বয়সের একটি ছেলের মুখে। তাকে বোধ হয় ওপাড়ার মুরুব্বিরা নাবালক ব'লে প্রতিরোধের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছিলো। সে এসে ব'লে গেলো, মিটিং হবে আজ রাতে, যেয়ো। কিসের মিটিং? তা দরকার কি। মরণচাঁদ নিজেই যাবে। এই সুযোগে শুনে আসবে কিসে দিন চলে ওপাড়ার।

মরণচাঁদ ফিরে এসেছিলো খবর নিয়ে।

'হুঁকোটা কই, অ সোদামুনি?'

'খবর কি?'

'খবর? না কই। কলকেতায় যেতে হবি.'

'কেন?'

'কেন কি? ভাবো বুঝিন, জমি সব ভগবানের?'

'উঠিয়ে দিবি?' সোদামুনি ভয়ার্ত বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়েছিলো।

'অন্যায্য।'

কে কথাটা বললো? অনেকেরই মনে আছে কিন্তু বললো কে? এদিক ওদিক চেয়ে সকলেই বুঝতে পারলো কথাটা বলেছে, মরণচাঁদের ছোট ভাই, এক রত্তি সোবান।

'হুম্।' ব'লে মরণচাঁদ শুম হ'য় ব'সে রইলো।

শুক্রবারের দিন কাণ্ডটা ঘ'টে গেলো। জমির মালিক এলো লোকজন নিয়ে। সঙ্গে পুলিস। দু-মিনিটের হাত কাড়াকাড়ি, ধাক্কাধাক্কি, পাঁচমিনিটের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। যে বসত বাড়ি দেখে হিরণ বলতো বাঁশ আর দড়ি নেই আমাদের অমন অমরাবতী কি ক'রে হয়, সেই বাড়িগুলি পিটিয়ে ভেঙে তছনছ ক'রে দিলো। তারপর জমির মালিক চ'লে গেলো, পুলিসও গেলো। লোকগুলি ভাঙা ঘরগুলির পাশে তাদের ছিটিয়ে ছড়িয়ে যাওয়া দারিদ্র্যের মধ্যে ব'সে রইলো সারা রাত। উনুন জ্বললো না। দু-একটা আগুন জ্বললো বোধ হয় অবুঝ শিশুদের খাবারের কোন ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। কিন্তু সোবাস কই? ফিরে নাই? এই প্রথম বোধ হয় মরণচাঁদ বিপন্ন বোধ ক'রেও হুঁকোর কথা বলতে ভুলে গেলো। অ সোদামুনি, সোবাস কই? হাঁকাহাঁকি, চেঁচামিচি। ওপাড়ার সেই লোকগুলির কাছে খবর পেলো মরণচাঁদ, সোবাসকে পুলিস ধ'রে নিয়ে গেছে। আর কয়েকজনকেও। মরণচাঁদ কাঁদলো না, হুঁকোও খেলো না। ব'সে থাকতে থাকতে তার বুকটা দুলে দুলে উঠছে, তাকেও নড়িয়ে দিচ্ছে।

পরদিন সকালে ভোজবাজির দৃশ্য। সামনের বসতি একেবারে খালি হ'য়ে গেছে। একজন লোকও নড়ছে না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

ঝড়ে বড়ো গাছ ফেলে দেয়, ঘাস খাড়া থাকে। বাবলার সরু সরু ডালের খোঁটায় হোগলার বাঁধনে বাঁধা হিরণের স্থাপত্য খাড়া হ'য়ে রইলো। পিছনের পাড়াই একমাত্র পাড়া। ডোবার পারের ছখানা ঘরই একমাত্র ঘর সে প্রান্তরে। তারা থেকে গেলো। তারা এত ছোট কেউ তাদের নজরেই আনলো না।

বিমলা একদিন বলেছিলো, 'মরণচাঁদ, সোবাসের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

নিবিষ্ট হ'য়ে তামাক খেলো মরণচাঁদ। তারপরে বললো, 'সে তো তিন বছর।'

'তিন বছর?' কথাটা বিমলার, কিন্তু বক্তব্য অনেকের।

'হুম্। দারোগাকে মারছিলো চেলা কাঠ দিয়ে। রক্ত বার হ'লে বেশী মিয়াদ হয়।'

সম্মুখে প্রান্তর, পিছনে রেললাইন। ডোবার ধারে আদিম কুঁড়ে। পাতা দিয়ে ভ'রে তোলা ডাঁটি কাঠির বেড়া। শুকনো কাশ আর খেজুর পাতার ছাউনি। বর্ষা এগিয়ে আসছে। কি উপায়? ভিক্ষা? প্রান্তর চষবে? প'ড়ে থাকার মানে এই নয় যে জমি ভগবানকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিন মাস হ'লো বসেছে তারা এখানে। দুমাস হ'তে চললো সোবাসকে পুলিস নিয়ে গেছে। তিন বছরের দু'মাস মাত্র গেলো।

ভুলটা ধরা দিলো হিরণের মধ্যে।

অন্য সকলের মতো সেও কষ্ট স্বীকার করতো। তার মতো অন্য সকলেরই যথাসর্বস্ব শেষ হ'য়ে এসেছিলো। ব'সে খেলে কুবেরের ধনও শেষ হয়। তাই করার আর কিছু না পেলে সে মা লক্ষ্মীকে ডেকে নিয়ে পাশা খেলে। কিন্তু একটা দোষ ছিলো হিরণের। দিনে একবার সন্ধ্যায় সে গাঁজা খেতো। শহরে সে জন্য মাঝে মাঝে যেতে হ'তো তাকে। অনেক সময়ে তার বউ সঙ্গী হ'তো।

এক সকালে মরণচাঁদ গিয়ে ডাকলো, 'হিরণ, ঝাঁপ বন্ধ কেন, রাতে ঘুমাও নাই?'

সাড়া নেই। বেড়ায় শত শত ফাঁক। একটাতে চোখ বসালো মরণচাঁদ। ঘরের মেঝেতে বিছানা মাদুর ছেড়ে এসে কেমন যেন বেঁকে চুরে শুয়ে আছে হিরণ।

মরণচাঁদ ঝাঁপ ঠেলেই ঘরে ঢুকেছিলো। হিরণের চোখ বড়ো বড়ো, দৃষ্টিহীন, মুখের কষে ফেনা, গা ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট। সকলকে ডেকে এনেছিলো মরণচাঁদ।

'আহা সাপে দংশেছে।'

শুধু বিমলাকে এক পাশে ডেকে মরণচাঁদ বিবর্ণ মুখে বললো, 'মা ঠাকরুণ, যে রোগে মানুষ নিজেকে মেরে ফেলায় সে রোগ বড় ভয়ানক। আর—'

'কি?'

'আর এক রোগ। হিরণের বউ?'

তাই তো, কোথায় সে?

ঘর দু'খানা পড়ে রইলো। দলপতি হিরণের মৃতদেহও। মরণচাঁদের দল সেই রাতেই হাঁটতে সুরু করলো। সোবাস? ঠোঁট কাঁপছে, জলে চোখ ঝাপসা হচ্ছে—কিন্তু উপায় কি দলপতির? কে একজন বলেছিলো—পিছনে তাকাস নে।

অনেক হেঁটেছে তারা। এ ক্যাম্প থেকে ও সাময়িক ক্যাম্পে। এখানে ডোল চেয়ে ওখানে পথের মাটি কেটে। অবশেষে এই হলুদমোহন। কূল পাওয়া? শ্রীকান্তর কথায় তাই মনে হয়। সন্তান এক ধরণের স্থিতিরই প্রমাণ বৈকি। কিন্তু খবরটা একই সঙ্গে আসে কেন? লতার কূল হারিয়ে যাওয়ার?

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে·বর্ষার জল চলতে দেখেছে বিমলা। শৈবালজাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদকে প্রায়ই সে ভেসে যেতে দেখেছে জলের স্রোতে। ডোবার শ্যাওলা, স্রোতে বাঁচে না, মাটির দিকে ঝোঁকে। বর্ষায় ডোবা আর নদীর খাত একাকার হ'য়ে গেলে তারা ভেসে পড়ে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছে শৈবালগুলি পারের দিকে এসে যেন মাটি কামড়ে ধরতে চায়, দু-এক মুহূর্ত পারেও তা, তারপরই আবার স্রোতের টানে ভেসে যায়। লতা ভেসে গেলো।

আর তা যদি বলো গোটা হলুদমোহন ক্যাম্পটারই তো অজ্ঞাতের দিকে ভেসে যাওয়ার কথা। দণ্ডকারণ্যের জোয়ার লেগে ক্যাম্পটাই টলোমলো করছে।

'চা দেবে না?'

'চা-ই তো করছি। ঘড়ির কাঁটায়।' বিমি হাসলো। অবাকও হ'লো নিজের হাতের দিকে চেয়ে। এত সব ভাবতে ভাবতে কখন যে সে উনুন ধরিয়ে চা করতে বসেছে খেয়ালই করেনি।

'কি ক'রে বুঝলে, আমি এসেছি?'

উত্তরটা কঠিন হ'লো বিমির পক্ষে।

বলতে গেলো—এ সময়েই তো রোজ আসো। কিন্তু বাইরের দিকে চোখ পড়তেই সে বুঝলো অন্যদিনের চাইতে অনেক দেরিই করেছে ফিরতে ভুবনবাবু।

বললো, 'এতো দেরি যখন হয়েছে, আর দেরি হবে না এই বোধ হয় ভেবেছিলাম।'

'বেশ বললে।' এই ব'লে ভুবনবাবু হাসলো। 'চা নিয়ে ঘরে এসো। তোমার চা-ও।'

ঘরে গেলো বিমি।

'বসো। চা খেতে খেতে কথা বলি।' বললো ভুবনবাবু।

বিমি বললো, 'দেরি হ'লো যে?'

'মাস্টারিটা সেরে এলাম।'

'টিউশানি ?'

'হ্যাঁ। সেদিন অনুমতি দিলে যে। হাতের কাছে যা পেলাম নিয়ে নিলাম। ক্লাশ টেনের ছাত্র। শুধু অঙ্ক, সপ্তাহে পাঁচদিন।'

'কষ্ট হবে তো।'

'এখন তো শরীরটা ভালোই যাচ্ছে।'

চা শেষ হ'লে বিমি উঠতে যাচ্ছিলো।

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'কাপ রেখে আসি।'

'দেখি, তোমার হাত দেখি।'

'হাত !' হাত বাড়িয়ে দিলো বিমলা।

পকেট থেকে একজোড়া বালা বার ক'রে পরিয়ে দিলো সেই হাতে ভুবনবাবু। বিমি কোন কথাই খুঁজে পেলো না। ভুবনবাবু তখনও তার দুটি হাত ধ'রে আছে। নিজের দুই বাহুর আড়ালে মাথাটা নামিয়ে আনলো বিমি। হঠাৎ তার দু-চোখ ভরে জলও এলো।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ তুললো সে।

'কি দরকার ছিলো এ সবের, ভুবনবাবু ?'

'সব কিছু কি দরকারের মাপে মাপা যায়। বললো হাতির দাঁত, সন্দেহ আছে। কতটুকুই বা সোনার তার। কিন্তু কি সুন্দর মানালো তোমাকে।'

'ছাত্র পড়াতে গিয়েই ধার হ'লো।'

'মোটেই না। দস্তুর মতো পাওনা টাকায়। পুরনো একটা বিল আজ পেলাম।'

স্থিতি ! এই নাকি স্থিতি ? কারো কারো মুখে শুনেছে বিমি। মুখে নয়, এক আধুনিকার রংচং-এ ভাষায় লেখা খবরের কাগজের রবিবারী প্রবন্ধেও যেন পড়েছে—বলয়ই হচ্ছে স্ত্রীলোকের শৃঙ্খল। স্থিতির জন্য তার প্রতীক হিসাবে আজ তা পৌঁছে গেলো তার হাতে ? পরিক্রমার শেষ। সেই পুরনো কথা—আর এত সস্তা প্রতীক !

॥ চার ॥

আর কোথায় সে যাবে? অনেক দূরে দূরে ভ্রমণ করে এসেছে সে। বজ্রযোগিনী থেকে কলকাতার পথ ছুঁয়ে এই হলুদমোহন। তারও আগে যদি বলতে চাও রেঙ্গুন থেকে। হলুদমোহনে পৌঁছেই কি শেষ হয়েছিলো?

আর কোথাও সে যাবে না।

নিজের হাত দুখানার দিকে চোখ পড়লো। বালা জোড়া পরাই আছে। খুলে রাখবে? একটিতে রান্না করতে গিয়ে কালি লেগেছিলো। বরং আঁচলে ঘষলো বিমি।

বাড়ির বাইরের দিকে বারান্দায় গিয়ে বসলো সে সিঁড়িতে পা রেখে। যেন সেটা দুপুরের জলাশয়ের নীরব কোন ঘাটলা। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে কচিৎ কখনও কেউ যায়। সে যাওয়া আসা মেঘের ছায়ার মতো কিংবা বাতাস লেগে গাছের পাতা ন'ড়ে ওঠার মতো। এমনি ছিলো তার দুপুর। কিন্তু কিছুদিন থেকে সে শান্তিটা সে আর পাচ্ছে না।

বরং একটা অস্থিরতাই বোধ হয়।

কাল তারা হাটে গিয়েছিলো।

এই শহরের একটা বৈশিষ্ট্য এই হাট। শহরে দৈনিক বাজার আছে দুটো। রোজ বাজার বসে সেখানে কিন্তু সেগুলি সত্ত্বেও এই হাট বসে প্রতি মাসের শেষদিনে। এক সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো এই হাটের। এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কথায় প্রতি মাসের মেলা। হাট বলো, হলুদমোহনের। ধীরে ধীরে হ'লেও হাটের জাঁক অনেকটা কমে এসেছে। নানা কারণ থাকতে পারে তার। একটা কারণ বোধ হয় এই, বাণিজ্যটা এখন উৎপাদকের হাত থেকে ফড়েদের হাতে চ'লে গেছে। তা সত্ত্বেও এখনও কিছু কিছু তাঁতী এসে বসে, কোন কোন কৃষক আনাজের ঝাঁকা নামায় মাথা থেকে। আর ক্রেতাও আসে। আর এ শহরে এসে অন্তত একবার লোকে এ মেলায় যায়।

সাধারণ হাটে স্ত্রীলোকেরা যায় না কিন্তু মেলায় যায়। যেহেতু এই হাটের অন্য নাম মেলাও বটে সে জন্যই যেন পুরুষদের সঙ্গে কিছু কিছু

স্ত্রীলোকও থাকে। কৃষকদের নারীরা নয় শুধু, সখ ক'রে শহরের মেয়েরাও যায়, বিশেষ ক'রে এই শহরে নতুন এলে।

হাটটা শহরের কেন্দ্র থেকে খানিকটা দূরে। অন্তত সেটার ধারে কাছে বাড়িঘরগুলিতে একটা গ্রাম্য ভাব আছে। লোকে কিন্তু বলে এটাই সাবেক শহর। ইট সিমেণ্টের নতুন শহরটা ডানদিকে অনেকটা স'রে গেছে, যেন নদীটাকেও পার হ'য়ে যেতে চায়।

ছুটির দিন নয়, তবুও বিমি বলেছিলো—কোথাও চলো।

টেবিলের ধারে ধার চেপে ধ'রে দাঁড়িয়েছিলো সে। যেন কোথাও থেকে পালিয়ে এলো এমন ক'রে বুকটা ওঠা নামা করছে তার পরিশ্রমে।

দুপুরের কিছু পরে তারা বেরিয়ে পড়েছিলো। ভুবনবাবু যানবাহনের প্রস্তাব করেছিলো, বিমি রাজি হয়নি।

'তা হ'লে তো হাটে যাওয়াই ফুরিয়ে গেলো।'

'চলো তা হ'লে যে রকম যেতে চাও।'

প্রায় এক মাইল হেঁটে এই হাটে গিয়েছিলো তারা। ভুবনবাবু শাকশব্জী কিনেছিলো। বিমি সখ ক'রে একটা ঝাড়ন কিনেছিলো। তারপর তারা দোকান দেখে বেড়াচ্ছিলো। একবার কথা-না-বলাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো। তখন বিমি বলেছিলো, 'এই হাট নাকি ফড়েদের উৎপাতে নষ্ট হ'তে বসেছে। তারা যদি গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মাল, তাঁতীদের মাল কিনে আনে তবে এ হাটে শহরের থেকে সস্তা হয় কেন জিনিসপত্র? কৃষক বা তাঁতী এরাই বা আদৌ কেন আসে সব মাল ফড়েদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে?'

'ফড়েরা আড়ৎদার মহাজনের দালাল। কৃষকরা ঘরে ব'সে যা দাম পায় তার চাইতে কিছু বেশি দামেই বিক্রি করে এখানে। কিন্তু সে দামে মহাজনদের লাভের অংশটা যোগ হয় না ব'লে শহরের দামের চাইতে সস্তা।'

'তা হ'লে তুমি বাণিজ্যও বোঝ, ভুবনবাবু?' বিমি সুআলাপীর মতো একটা হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলো মুখে।

কিন্তু বাণিজ্য নিয়ে আলাপ এগোয় না।

চট দিয়ে তৈরি ছাদ, চটের স্বচ্ছপ্রায় দেয়ালের মধ্যে মনোহারী দোকান। দোকানগুলি সব ছ' আনার দোকানগুলির মতো। ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পড়েছিলো এই দোকানগুলির কাছে।

পিছন থেকে চিনবার কোন উপায় নেই। মেরুদণ্ডের গাঁটগুলি উঁচু হ'য়ে

আছে। তৈলহীন ত্বক খসখসে। কাঁধের উপরে একটি তিন চার বছরের ছেলে। ছেলেটির পরনে একটি নতুন প্যান্ট, যার গায়ে প্রস্তুতকারকের নামধাম তখনও সাঁটা আছে।

ভুবনবাবু না ব'লে দিলে মরণচাঁদকে চিনতে পারতো না বিমি।

কিন্তু বিমি বললো, 'কি ভাবছো?'

'জিরিয়ে নেবে একটু?'

'জিরিয়ে কি হবে? ঘুরে ঘুরে দেখে নি বরং। তাঁতীদের মহল্লায় চলো।'

'আবার?'

মরণচাঁদকে না-চেনার ভানই যেন করেছিলো বিমি।

'চলো না দেখি সস্তায় বালিশ ঢাকবার কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

ক্লান্তি। কথাটা যেন দেহের মধ্যেই থাকে তার নাম উচ্চারণের অপেক্ষায়। ক্লান্তি, ক্লান্তি।

কিন্তু বিমি বললো, 'বাড়ি গিয়েই খুব ভালো ক'রে চা করে দেবো।' কেমন একটা অদ্ভুত হাসি বিমির মুখে।

ভুবনবাবুও হাসলো। চশমাটা খুলে ধুলো মুছে নিলো।

বেড়ানো তো খেলাই। হাটে আসাটাও এমন কিছু কাজের নয়। খেলাই এটা বিমির! সে কি মনের সঙ্গেই খেলছে?

কিন্তু মরণচাঁদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো বিমির।

ভুবনবাবুকে সে হাত তুলে নমস্কার করলো। খানিকটা সময় সে অভিভূতের মতো বিমির দিকে চেয়ে রইলো।

ভুবনবাবু বললো, 'কি রকম আছো মরণচাঁদ?'

'তা ভালোই। মা ঠাকরুণ,—'

'হ্যাঁ, মরণচাঁদ, আমিও ভালো আছি।'

একটু ইতস্তত ক'রে মরণচাঁদ বললো, 'বাড়ি ফেরেন? আমি মা-ঠাকরুণের সঙ্গে গোটা দুচ্চার কথা কই?'

'তা বলো।'

'মাসি আসছে, মা ঠাকরুণ, শুনছো?'

'সোদামুনি বলেছে।'

'হাঁ। সোদামুনি। সেই আমাকে ক'লো, তুমি এই শহরেই আছ। ভাবি যায়ে চরণ দেখে আসি, তা হয় না। তা, মা ঠাকরুণ, দণ্ডকাইন্ত যাওয়া আর আমার হয় না।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'তা কবো। মাসি কয়, মরণ এই ছেইলে নেও। আমি আর খাতে দিতে পারি না। কয় আমি থাকেও তোমার গলগ্‌গোহ। ছেইলে নেও আমি যেখানের চ'লে যাই।'

'কিন্তু তার সঙ্গে দণ্ডকারণ্য যাওয়ার কি সম্বন্ধ?'

'তা, মা ঠাকরুণ, তুমি দণ্ডকান্নই কও আর দণ্ডাইন্ত, কথা একই। জঙ্গল তো। ছেইলে কাঁধে নিয়ে জঙ্গল কাটে চাষ হয়? কও।' অদ্ভুতভাবে হাসলো মরণচাঁদ।

ফিরবার পথেও আবার মরণচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। একটা গোরুগাড়ি বড়ো জ্বালাতন করছিলো ধুলো উড়িয়ে। তাকে এগিয়ে যাবার সুবিধা দেয়ার জন্য তারা পাশ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তখনই মরণচাঁদ এলো।

ভুবনবাবু বললো, 'বেশ ছেলে তোমার মরণচাঁদ, কি নাম?'

'আঁগে। অবিমন্নো।'

'স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিও।'

'তা দোব আঁগে।'

'আর কষ্ট হ'লেও লেখাপড়া শিখিও।'

'আঁগে অগত্যা।'

বিমি বলেছিলো, 'এই ধুলোর মধ্যে আর ইস্কুল মাস্টারি কোর না। আর মরণচাঁদ, তুমিও এগিয়ে যাও লম্বা লম্বা পায়ে। সারাটা পথ গাড়ির পিছনে ধুলো খেতে খেতে যাবে কেন?' মরণচাঁদের নিজের ইচ্ছাও বোধ হয় সে রকমই ছিলো। সে তাদের ছাড়িয়ে চ'লে গেলো। যাবার সময়ে মিটমিট ক'রে হাসলোও। বোধ হয় ভুবনবাবুর উপরে তার মা ঠাকরুণের খবরদারি করার ভঙ্গিটা তার ভালো লেগে থাকবে।

শহরেরই কিন্তু সংস্কারহীন পথ। বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো আর ধুলো। পায়ে হেঁটে ফিরতে হ'লে এটা সোজা। ঘুরে যাওয়া যায় নতুন শহরের ধার ঘেঁষে। লোক চলাচলের ফলেই কি এখন ধুলো বেড়েছে?

ভুবনবাবু বললো, 'মনে হচ্ছে গাড়িটাই এমন ক'রে গেলো। একটু ঘুরে চলো ধুলো বাঁচিয়ে। রিকশা নিই বরং।'

রিকশা নিলো ভুবনবাবু।

'মাথা ধরেছে নাকি?'

রিকশায় ব'সেই একটা হাত উঁচু ক'রে নিজের কপাল ছুঁয়ে বসেছে বিমি।

'কই না।' ব'লে সে হাত নামালো। কিন্তু তার ক্লান্তিমাখা মুখে অস্বস্তিই ফুটে উঠলো।

ক্লান্তি, ক্লান্তি। অনুবভটাকে স্পষ্ট করার জন্য সে কথা খুঁজলো। যে কয়েকটি পেলো তাতে লাভ হ'লো না কিছু। সেগুলো বাদ দিয়ে যা থাকলো সেটা ক্লান্তি।

মরণচাঁদের সঙ্গে বাইরে দেখা হওয়া অধিকন্তু। মনে তো তারা রয়েছেই। হলুদমোহন ক্যাম্পটাই সে ব'য়ে বেড়াচ্ছে মনে মনে। আর মরণচাঁদকে না চিনে উপায় আছে? তার একটা বৈশিষ্ট্য তার দৈহিক উচ্চতা। এখন সে হৃতস্বাস্থ্য পূর্বের কঙ্কাল, তা সত্ত্বেও হাটের সহস্র লোকের ভিড়ের উপরে তার মুখ দেখা যাচ্ছিলো। কি লাভ হ'তে পারে দূরে স'রে গিয়ে?

কিছু একটা বলার জন্য বিমি বলেছিলো, 'মরণচাঁদের ছেলের নাম অবিমন্নো।'

'অভিমন্যু? বেশ নাম।' ভুবনবাবু বললো।

খানিকটা নীরবতা।

বিমি আবার বললো, 'তোমার স্কুলে যাবার পথ কি এটাই?'

'না।'

আবার নীরবতা।

কিন্তু তখন ভুবনবাবু বললো, 'দু'জনের মধ্যে ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে কেন? আরাম করে ব'সো। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

দুপুর-দিঘির ঘাটলা। কিন্তু অনুভব করলো বিমি স্তব্ধতাকে মুখর ক'রে তুলেছে অনেক ক্ষুণ্ণতা। সেই নীরব অস্থিরতায় ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছে।

আর এখানে এখন তো সোদামুনি নিজেই আসতে পারে। আসাটা যেন তার অভ্যাসেই দাঁড়াবে। দণ্ডকারণ্যের কথাই তুললো সে। সেখানে নাকি সব নতুন হ'য়ে উঠবে?

'মরণচাঁদ কি বলে ?'

'কাল রাতে ক'তে যায়ে কাঁদে কাটে কথা বন্ধ করলো। যাব যে, সোবাস কোথায় ? সে কি দণ্ডকারে পথ চিনে যাতে পারে ? মানুষ দেখে বোঝা যায় না, মা ঠাকরুণ, তার বুকের কি জ্বালা। কয় হিরণ কি ভয়ই দেখালো চ'লে আলাম। সোবাস কি আর খুঁজে পাবি ?' সোদামুনিও চোখ মুছলো।

মানুষ দেখে তার অন্তরে জ্বালা কখনও বোঝা যায় না। মরণচাঁদ সোবাসের নাম মুখেও আনে না। হিরণের সেই ছোঁয়াচে রোগ থেকে দলটাকে বাঁচাতে গিয়ে দলের নেতার কাজই সে করেছিলো। কিন্তু সোবাস তো এখনও জ্বলছে তার বুকের মধ্যে।

বিন্নি বললো, 'তোমাদের মাসির খবর কি ?'

'যাতে চায়, তেনি কয়, না। কয় বাড়ি যতি করলাম ক্যাম্প থিকে যাড়ায়ে তবে সে বাড়িতে মা-মাসি না থাকলি সংসার ?'

মরণচাঁদ এখনও কল্পনা ত্যাগ করেনি।

এর পরে হয়তো শ্রীকান্তর কথা আসতো কিন্তু এলো মালতী। এর আগে একদিন যেমন ক'রে এসেছিলো, আজও ঠিক তেমনি ক'রেই। সোদামুনি, তারপরে মালতী।

মালতী পল্লীর মধ্যে থেকে এলো না বরং ক্যাম্পের দিক থেকে। তার মুখ থমথম করছে, চোখ দুটি জ্বলছে। 'এই যে আপনি এখানে' ব'লে সে থেমে দাঁড়ালো সোদামুনির সামনে।

সেদিনের শোভাযাত্রার পর সভা হয়েছিলো, আর তারই প্রস্তাব অনুসারে মালতী যুক্ত প্রতিবাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। কেউ স্বাক্ষর দিয়েছে, কেউ দেয়নি। মরণচাঁদ এখনও মনঃস্থির করতে পারছে না। কিন্তু বিপদ তো তাদেরই বেশী হয় যারা পথ খুঁজে না পেয়ে এপথ ওপথ করতে থাকে। এই বললো মালতী।

সোদামুনি বললো, 'তাইতো। তাইলে এক কথা কই। তেনি কয় তখন মা ঠাকরুণ ছিলো। তার সুবিধা করতে হবি এই ভাবতে গিয়ে পথ খুঁজে পেতাম। এখন কার জন্যে পথ খোঁজা ?'

'মা ঠাকরুণ ? সে আবার কে ?' মালতী প্রশ্ন করলো।

'কেউ নয়। সেটা ওদের একটা কল্পনা।' বললো বিন্নি। ভাবলো এটা কি শুধু মালতীকে নিবৃত্ত করার জন্যই তোলা একটা যুক্তি ?

'চুলোয় যাক কল্পনা। বউদি, এখন কি আর ওদের কল্পনা করার সময় আছে? আর সাতদিন মাত্র বাকি। তারপরই এসে যাবে ওদের সরানোর লোক।' কালকের মধ্যে সই শেষ ক'রে প্রতিবাদ ম্যাজিস্ট্রেটকে পৌঁছে দিতে হবে। কেন সই পেলাম না জানো? ওই সুরথের জন্য। একা সে নয়। তার স্ত্রী আর অজয়ের জন্যও।'

'সুরথ? সে কি যেতে চাচ্ছে?'

'যেতে নয় মরতে। তুমি কি কল্পনা করতে পারো যে সে চাষ করছে? বললো সরকার কখনও ভুল সংবাদ দেয় না। মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরেছে। লোকটার ভিতরে নিশ্চয় দোষ আছে নতুবা এমন ঘুণ ধরে? নতুবা শিক্ষিত হ'য়ে এমন মূর্খের মতো কথা বলে?' মালতী একদমে এই ব'লে হাঁপাতে লাগলো।

'দাঁড়িয়ে রইলে। বসো, আসন নিয়ে আসি, বসবে।'

'না, বসবো না; কাজ আছে।' মালতী দ্রুতগতিতেই চ'লে গেলো।

'মা ঠাকরুণ—' বললো সোদামুনি। বিবর্ণ হ'য়ে গেলো তার মুখ।

'সাতদিন বললো যে, সোদামুনি।'

'তাই বললো', ঠোঁট কাঁপলো সোদামুনির। সে উঠে দাঁড়ালো। 'মনে কয় তেনিও শুনছে।'

সোদামুনিও চ'লে গেলো।

যাওয়াই ভালো। এখন হয়ত মরণচাঁদ হুঁকো হাতে ক'রে অস্থির হ'য়ে বেড়াচ্ছে। এক সময়ে মনে হ'তো বিমলার, তার হুঁকো খোঁজার ভঙ্গিতে বিড়ম্বনাকে প্রতিপক্ষ খেলুড়ে হিসাবে ডাকবার মতো সরসতা আছে। এখন হুঁকো খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে অ সোদামুনি আর বলে না সে। কিংবা হয়তো হুঁকো হাতে করার মতো সরসতাও আর নেই। একথা মনে হওয়ার কারণ হিসাবে এই বলা যায়, মরণচাঁদের একটা আদর্শবাদ ছিলো যা তাকে পথ দেখিয়ে দিতো। এখন যেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো জোরই সে পাচ্ছে না।

কিন্তু সুরথ? সে তা হ'লে তেমনি আছে, যেমন ছিলো বিমি যখন তাকে শেষ দেখেছিলো।

চিন্তাটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো বিমি।

বরং সে সম্মুখে চেয়ে দেখতে পেলো একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে চাকা চালাতে চালাতে রাস্তায় দৌড়ুচ্ছে। নতুন বাড়িটা ছাড়িয়ে কিছু দূরে এসে

পড়েছিলো, আবার ফিরে গেলো দৌড়ুতে দৌড়ুতে। ওই বাড়িরই ছেলে নাকি? হয়তো ওর মা কাজকর্ম সেরে এখন বিশ্রাম করছে, কিংবা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকের এমন হয়। ছেলেটি বেরিয়ে পড়েছে সেই অবসরে। ছেলেটি একবার থেমে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবলো, তারপর চাকা নিয়ে দৌড়ুতে সুরু করলো। হু-হু ক'রে ছুটে যেন সে উধাও হ'য়ে যাবে। অনেকটা দূরে সে ছুটেও গেলো কালো রাস্তাটা ধ'রে, ক্যাম্পের দরজার কাছাকাছি। ছুটে বোধ হয় হাঁপিয়ে পড়েছিলো। একটু থেমে চাকা ধ'রে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগলো বোধ হয়। তারপর ধীরে ধীরে চাকা চালিয়ে নিয়ে আবার নিজের বাসার দিকে ফিরলো। ওর মায়ের বোধ হয় এতটা নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো নয়।

চিন্তাটায় ফিরে এলো বিমি।

নদীর স্রোত দেখা যাচ্ছে না, কারণ নদীটাই সময়। আর সাত দিনের সঞ্চয় হ'লেই সেটা ক্যাম্পকে নিঃশেষ করার মতো ফুলে উঠবে, ফুঁসে উঠবে। এখনই যেন তার ধাক্কায় ধাক্কায় নভোমণ্ডল থরথর ক'রে কাঁপছে।

শেষবারের মতো পরিক্রমা করবে যেন ক্যাম্পটাকে বিমি। ক্যাম্পটার দিকে মুখ তুলে চাইলো সে।

আর এখন তা পারেও সে। বন্যায় আর যাই হ'ক সে ডুবে যাবে না। সে আর কোথায় যাবে বলো?

ক্যাম্পের গ্রন্থাগারটাই বসবার জায়গা ছিলো। অজয় বসতো, মোহিত এবং লতা আসতো। সুরথ থাকতো যেন অজয়ের ফাইফরমাস খাটার জন্যই। কখনও কখনও ডাক পড়তো বিমির। ডাকটা আসতো মরণচাঁদের ব্লকের খবর নেওয়ার জন্য। ক্যাম্পেও ব্লক আছে।

এমন কিছু আয়োজন ছিলো না। বাঁশের বেড়া, খড়ের ছাদ। তবু একটি প্রশস্ত ঘর, সে ঘরে জানলা দরজা ছিলো। দিনের বেলায় দিনের আলো যেতো, বাতাস চলাচল করতো।

প্রথম দিন গিয়ে বিমি এক ধরনের উত্তেজনাই অনুভব করেছিলো। উঁচু পাহাড়ে উঠে পরিচ্ছন্ন বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ ক'রে এমন অকারণ উল্লাস দেখা দেয় রক্তে। একই টেবিলের চারিদিকে ঘিরে বসতো অজয়, সুরথ, মোহিত এবং মোহিতের স্ত্রী লতা। আর গুহগিন্নীর ছেলে সৌম্যও। আলোচনার জন্য অর্থাৎ অভাব অভিযোগের ফর্দ তৈরি করার জন্যই বসা—কিন্তু আলাপ

অন্যদিকে চলে যেতো। সাহিত্যের কথা বলতে ভালবাসতো অজয়। হ্যাঁ, সেই ক্যাম্পের আওতায় ব'সে সে-ই ইদানীংকালের লেখকদের সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করতো। লেখকদের ঘরোয়া নামে উল্লেখ করাই ছিলো তার রীতি। এককালে সে সব লেখকদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিলো এমন ধারণা হ'তো। এ রকম সন্দেহ হ'তো বিম্মির, বলা যায় না অজয়ও যদি প্রচ্ছন্নভাবে কোন লেখকই হ'য়ে থাকে। কৌতূহলের সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য করতো বিম্মি কারণ কোন লেখককে সে কখনও দেখে নি। মোহিত বড়ো বেশী কথা বলতো না। খবরের কাগজখানা পড়তো। সুন্দর সুঠাম তার কাগজ ধরা হাত। যত্ন ক'রে দাড়ি কামাতে কখনও তার ভুল হ'তো না। আর লতা? খুব দামী শাড়ি ছিলো তার? কিন্তু কি যত্ন ক'রেই পরতো। চোখে কাজল আঁকতো কি আঁকতো না, কিন্তু চোখের কোলের একটা কালো কোমলতা তার দৃষ্টিকে আকর্ষণীয় ক'রে রাখতো। কোন কোন দিন একটু বেশী রাতই হ'য়ে যেতো। আটটা ন'টা তো বটেই। একবার বিশেষ ক'রে, পূর্ণিমার কাছাকাছি ছিলো রাত্রি। এত দেরি হ'য়েছিলো ফিরতে যে সব পাড়ার সবগুলো তাঁবু নিঃশব্দ হ'য়ে গিয়েছিলো।

অজয় ভাবটা দেখাতো যেন অনেক রাত অবধি তারা উদ্বাস্তুদের সুখ সুবিধা নিয়েই আলোচনা করেছে। কখনও খুব বেশী রাত হ'য়ে গেলে পরের দিন সে কিছু না কিছু ঘোষণা করতো। তা সে যতো সামান্যই হোক, উদ্বাস্তুদের জন্য সুবিধার দিকে ঝোঁক আছে এমন কোন ব্যাপার সে ঘটাতো, যেমন র‍্যাশনটা, কিংবা সপ্তাহের ক্যাশ ডোলটা সপ্তাহ শেষ হওয়ার একদিন আগেই দিয়ে দেয়া। একটা যত্নই ছিলো অজয়ের তাদের সে সব বৈঠককে গোপন রাখার। পাপ ছিলো মনে? লতা? হ'লে সেটা নতুন কিছু হ'তো না। অন্তত উপর থেকে দেখে তেমন সন্দেহ কেউ করলে অস্বাভাবিক হ'তো না। ওদিকে সুখ সুবিধার সর্বময় কর্তা—এদিকে লতার মত ঢলানি মেয়ে।

বিম্মি তখনও ছেলেমানুষ ছিলো না। আর এ পথে এসে ঘুরে ঘুরে সে বোধ হয় মানুষ চিনতেও শিখেছে। মেয়েদের সম্বন্ধে কি অজয়ের কৌতূহল ছিলো না? ছিল, কিন্তু তার জাত আলাদা।

আর লতা? লতা সম্বন্ধে কিছু বলা খুব সহজ নয়। ঢলানি মেয়ে ব'লেই তার অখ্যাতি কিন্তু তার সেই তরলতা—একটা উপমা এক সময়ে বিমলা তৈরি ক'রে নিয়েছিলো, যেন কোন কঠিন কাঁচের গোলকের মধ্যে আবদ্ধ। স্বচ্ছ

আবরণের তলায় সরসতার আভাস দেখা যাচ্ছে, স্পর্শ করতে গেলে কঠিন শীতল গোলকটিতেই প্রতিহত হবে তৃষ্ণা। কিন্তু এ সব ধারণা তার মনে নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিলো পরে।

তা সত্ত্বেও কিন্তু লতাকে বিপজ্জনক কিছু ব'লেই মনে হ'তো। সেই পূর্ণিমার রাত্রিটার পরিণতি ছিলো। গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে সকলেই দাঁড়িয়েছে গ্রন্থাগারের সামনে। মোহিতবাবু দরজায় তালা দিচ্ছে। অন্য সকলের মতোই দাঁড়িয়ে লতা, কিন্তু মনে হ'তে লাগলো চাঁদের আলো যেন তার চোখ, ঠোঁট, কপাল, চুলের তরঙ্গ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে।

চলতে সুরু করলো সকলে। সুরথ অজয়ের সঙ্গে গেলো। অজয়কে তার কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেয়াই তার রীতি। বিমি দেখলো সৌম্য ইতিমধ্যে লতার পাশে পাশে হাঁটতে সুরু করেছে। হাঁটছে যেন পা-পা ক'রে। বিমিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া ?

এখন আর ছি-ছি টা মনে হ'লো না। কতটুকু ছেলেই বা সৌম্য। কুড়ি পেরিয়েছে কি না পেরিয়েছে। সে রাত্রিতেই কি সৌম্যের সঙ্গে তারও প্রথম কথা হয়েছিলো ?

বিমির মন যেন একটা সচেতন চেষ্টায় মোড় ঘুরলো। সুরথের কথা ভাবতে গিয়ে অন্য পথে চ'লে এসেছে সে।

সুরথ সে রাত্রিতেও অজয়কে তার কোয়ার্টার্সের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিলো। অজয়কে খোশামোদ করাই তার অভ্যাস ছিলো। তাই বলে বিশেষ কোন সুবিধা ? অথচ খোশামোদের উদ্দেশ্যই তো সুবিধা আদায়। উদ্বাস্তুদের ব্যবহারের জন্য কিছু এসে থাকবে জড়িয়ে। অনেকটা চট পড়েছিলো গ্রন্থাগারের পাশেই।

'ওগুলো কি, চট ?'

'হ্যাঁ। প্যাকিং-এর। নেবেন ?' অজয় বলেছিলো। 'কাজে লাগে নিয়ে যান।'

'কাজে আবার লাগে না। তাঁবুর মেঝেতে বিছানো যায়, তাঁবুর উপরে বিছিয়ে তাঁবুর সংস্কার করা যায়। খানিকটা চট পাওয়া তো সৌভাগ্য।'

'তা হ'লে নিন না। এরকম চট আমার অফিসেও অনেক প'ড়ে আছে।'

চট সবাই নিয়েছিলো এমন কি বিমলা এবং সৌম্যও।

'আপনি নেবেন না ?' বললো অজয় সুরথকে।

'আমি ?'

'আপনার দরকার নেই ?'

'দরকার। মানে, না—থাক।' স্থরথ বললো।

'আপনার সব কিছুতেই ভয়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন আমি দিয়েছি।'

'না ভয় আর কি ?' এই কথাটা বলতে স্থরথ কেশে গলা সাফ ক'রে নিয়েছিলো।

'আপনি বড্ড ভয় পান মশায়।' অজয় হেসেছিলো।

স্থরথ মাথা নিচু করেছিলো। অজয় যেন তার চরিত্র সম্বন্ধেও দেবতার মতো অভ্রান্ত।

এটা স্থরথের ভয়েরই উদাহরণ। প'ড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে এমন দু-চার হাত প্যাকিং-এর চটের ব্যাপারেও কি অসামান্য ভয়।

সৌম্যই বলেছিলো একদিন। বড্ড ভয় পায় স্থরথদা। সেই চটের কথায় সে নিজেই বলেছিলো আমাকে একদিন। বলেছিলো অজয়বাবু দিচ্ছেন ব'লেই কি নিতে পারি ? যদি অডিট হয় ? অজয়বাবু যদি সরকারের কোন জিনিস তোমাকে বে-আইনিভাবে দিয়ে থাকেন, তা হ'লে অজয়বাবুর যেমন দোষ, তুমি নিয়েছো ব'লে তোমারও তেমন দোষ।

কথাটা হচ্ছিলো একটা গাড়ীর কামরায় ব'সে।

'তা হ'লে অজয়কে খোশামোদ করে কেন স্থরথদা তোমার ?' বলেছিলো বিমি।

'ধারণা বোধ হয় অজয়দাকে খোশামোদ করলে আইনকেও খোশামোদ করা হবে।'

'তুমি ক্যাম্পের অনেক কিছুই জানো অনেকের সম্বন্ধেই।' বিমি বললো।

'তা জানি। কি ক'রে জানলাম ভেবে আশ্চর্য হই।'

'তুমি বোধ হয় খানিকটা সহৃদয়, সৌম্য।'

খুশি খুশি লাগছিলো বিমির। ট্রেনের পথের দু'ধারে কি সুন্দর লাগছিল দেখতে। নুয়ে নুয়ে যাওয়া সবুজ। গুল্ম, কাঁটা, আগাছা।

সৌম্য এক সময়ে বলেছিলো, 'রাজনীতি যেন আগেকার ঘটনা যার পর থাকে বাস্তহীনতা। কিন্তু এই পরিণতিতে পৌঁছানোর অন্য অনেক পথই আছে রাজনীতি ছাড়া।'

আর সুরথই তার প্রমাণ। সুরথ পাকিস্থান থেকে আসেনি উদ্বাস্তু হ'য়ে। তার কথায় উত্তর কিংবা পূর্ববঙ্গের টান কিছু পাও? পাও না তো? বাস্তুহান কেন হয়েছে সুরথ তা বলেছিলো সৌম্য।

'ঠিক তোমাকে যা বললাম তা হয়তো ঘটেনি। তা জানতে হ'লে সমস্ত ঘটনা সামনে রেখে গবেষণা করতে হবে। কিন্তু তাতেও কি সত্যটাকে ধরা যাবে? কাজেই খুঁটিনাটি জেনেও লাভ নেই, ব'লেও নেই। সুরথ ব্যাঙ্কে কাজ করতো।'

'ব্যাঙ্কে। মানে—'

'আইনের দিকে একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক হয়েছে। আইন ভাঙার কথা বললে তা সে যে আইনই হ'ক ওর মনের এমন একটা অংশ বিচলিত হ'য়ে ওঠে যার উপরে শরীর এবং মনের অন্যান্য অংশকে সক্রিয় রাখার দায়িত্ব দেয়া আছে। শীতের দিনে আমি তার কপাল ঘেমে উঠতে দেখেছি অজয়ের লেজার বইতে একটা ব্যাক ডেট বসানোর কথা শুনে। কোন একদিন সে এমন কোন আইনই হয়তো ভেঙে থাকবে।'

'টাকা পয়সা—'

'অসম্ভব নয়। ঘটনার কথা বলছ? একদিন সকালে সুরথকে ধ'রে নিয়ে গেলো পুলিস। বাড়িতে তার স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে। এই তো ঘটনা।'

'মানুষ অনেক সময়ে বাধ্য হয়ে অন্যায় কাজ করে। খেতে না পেয়ে, কিংবা নিজের খাওয়ার চাইতেও যা মহৎ, শিশুকে খাওয়ানোর জন্য—'

'এসব নিয়ে সামাজিক উপন্যাসও লেখাটেখা হয়েছে। দেখানো হয় লোকটা আসলে সৎ। যেন সৎ উদ্দেশ্যে যা-ই করো তাকে অসৎ বলতে দ্বিধা হবে। সুরথদার জন্যে আমি এরকম কোন সৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না। জানা নেই আমার।'

'চুরির জন্যই চুরি?'

'কেমন লাগছে শুনতে, তাই না। আমারও লাগে। কিন্তু ভুলও তো হয় মানুষের। হাত থেকে পড়ে দামী বাসন খান খান হয় না?'

এমনি ছিলো সৌম্যের কথা বলার ধরন কিংবা এমনও হতে পারে রেল-গাড়ির সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সেও উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিলো। আনন্দ নয় হয়তো কিন্তু কথা বলার অকুণ্ঠতা।

সৌম্য বলেছিলো, 'একটা ছোট ঘটনার কথা বলি এবং সেটা না ঘটলে আমিও সুরথদাকে পাকিস্তানের উদ্বাস্তু মনে করতাম। একদিন সুরথদার স্ত্রী আমাকে বলেছিলো তাকে স্টেশনে নিয়ে যেতে। সে কি! কোথাও যাবে নাকি? না। একজন আত্মীয় যাবে স্টেশন দিয়ে, দেখা করবো। গিয়েছিলাম। আত্মীয় গেলেনও। গাড়ির কামরার ধারে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই দু-একটা কথা হ'লো। সুরথের স্ত্রী কি বললেন আমি শুনিনি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমি গাড়ির আরোহীদের লক্ষ্য করলাম। স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের ছেলে। গাড়ি চলে গেলে আমরা ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে লাগলাম। কি হলো? চোখে কিছু পড়লো? কান্না? রাম কহো! আমরা ক্যাম্পের উদ্বাস্তু। আত্মীয়দের জন্য আমরা চোখের জল ফেলি? সুরথের স্ত্রী বুকের ওঠাপড়া নিয়ে চলতে পারছিলেন না। অবশেষে বললেন, সৌম্য, কাউকে না বললে আমি সইতে পারবো না। গাড়িতে যে ছেলেটিকে দেখলে সে আমার সে আমার।'

'মানে—'

হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো সৌম্য, তেমনি হঠাৎ সুরু করলো বলতে, 'না ছেলেটিকে বিক্রি করেনি তারা। ছেলেটিকে ভার বোধ হয়নি। তা সত্ত্বেও দিয়ে দিয়েছিলো। লিখে প'ড়ে পাকা কাজ।'

'ছেলের কল্যাণের জন্যই?' বিমলা প্রশ্ন করেছিলো।

'হতে পারে। ও ভেবে আর কি হবে। অপরাধটা রোগ কিংবা ভুল এ নিয়ে অনেক কথা আছে। কিন্তু সুরথ বলে যে সামাজিক জীবটা ছিলো সে কি আর থাকলো তারপরে। তার সমস্ত অতীত, তার সমস্ত চরিত্র কি মোমের মতো গলে গলে গেলো না সেই একটি মুহূর্তে। শহরে ফিরে কি আর সেই সুরথ ছিলো? সুরথ এই ক্যাম্পে না এলেও বাস্তু হারিয়ে ফেলেছিলো। গলে যাওয়াই নয় কথাটা? সবটুকু চরিত্র সবটুকু ব্যক্তিত্ব গলে গলে যাওয়া।'

সুরথ তা হলে যাবে দণ্ডকারণ্যে। কিংবা তাকে যেখানে পাঠাবে সেখানেই যাবে।

মালতীকেই দেখা গেলো আবার। এবার সে তার বাসার দিক থেকে শহরের দিকে যাচ্ছে।

'সেই থেকে ব'সে আছো?'

'উঠি।' বিমি হাসলো। 'কোথায় চলেছো এত তাড়াতাড়ি?'

'শহরে।'

'দলের অফিসে?'

'তাও বটে। শহরের ওপারে সুভাষ-পল্লীতে, হলুদমোহন ক্যাম্পেই আগে ছিলো এমন কেউ কেউ আছে। দেখি তাদের কাউকে আনতে পারি কি না।'

'দেখো।'

তাকে তো আর উদ্বাস্তু হতে হবে না। অগ্র পশ্চাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কথাটাই বিমির মনে জাগলো আবার। হলুদমোহন ক্যাম্প থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য সেটা কি তার মনের একটা চেষ্টা?

কেমন দেখাতো সুরথকে? কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথা। কপালে চিন্তার রেখা। ঠিক পাকা নয় চুল। কলপ ধুয়ে গেলে যেমন লাল লাল দেখায়। রং? মেকআপ? কিন্তু ভদ্র, অদ্ভুত রকমের বিনয়ী। অতি মৃদুভাষী। যেখানে প্রতিদিনই কলহ, সেখানে কেউ তাকে জোরে কথা বলতে শোনেনি।

হলুদমোহন ক্যাম্পের চারিদিকে জোয়ারের দোলা লেগেছে এ রকম একটা অনুভব জেগে উঠতে উঠতে মিলিয়ে গেলো বিমির মনে।

আর, বন্যার ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।

বাঁধ দিয়েছে শহর বাঁচানোর জন্য। সে জন্যই এদিকে প্রতি বর্ষায় এখন জল ওঠে না। আগে নাকি প্রতি বছরই চার মাস জলের তলাতেই থাকতো। তাই জমিটা সস্তাতে পেয়েছে এ পাড়ার বাসিন্দারা। আশ্রয় গড়ে তুলেছে।

কিন্তু মানুষের দেয়া বাঁধ। ফাটতে কতক্ষণ?

কিংবা ধরো এই জায়গাটাই আবার কোন মহত্তর উদ্দেশ্যে কারো প্রয়োজন হলো? যেমন হলুদমোহন ক্যাম্প হচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

আর চারদিন, যদি মালতী ঠিক সংবাদ আনতে পেরে থাকে। সংবাদটা সে ঠিকই এনে থাকবে। নাওয়া খাওয়ার সময় দিচ্ছে না নিজেকে।

'চা করছ বউদি? দাও তো একটু।'

'বসো।'

চা করছে বিমি।

'বাহ্, বেশ বালা জোড়া তো! ভুবনদার চোখ আছে।'

'তা আর নেই? তোমার খবর কি?' চা এগিয়ে দিলো বিমি।

'ভালো নয়।'

'বসো। তোমার দাদাকে চা দিয়ে আসি।'

চা দিয়ে ফিরে এসে বিমি দেখলো মালতী পিরিচে ঢেলে চা গিলছে।

'বলো এবার। ছুটছো কেন?'

'কি বলবো? পেরে উঠছি না। কয়েকটি লোক পেয়েছি সাহায্য করার। তুমি একটু যেতে পারো না?'

'আমি?'

'তোমার মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারলে অনেক কাজ হতো। অভাব বোধ করছি সৌম্যদার। সে থাকলে একা মোড় ফিরিয়ে দিতো। পারতো সে।'

'যাচ্ছ?' কি যেন ভাবতে গিয়ে হারিয়ে ফেললো মনের মধ্যে বিমি।

হঠাৎ মালতী ফেটে পড়লো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, 'অজয়, অজয়। ওর ভালো হবে কখনও?'

হন হন করে চলে গেলো সে।

রান্না চাপালো বিমি।

অজয়?

না, সৌম্য। সৌম্যর বয়স কতই বা হবে। চিবুকে কয়েকটি দাড়ি ছিলো লম্বা। সব সময়ে থাকতো না। মাঝে মাঝে কামাতো। দিন পনরো ধরে বেড়ে আবার আগের মতো।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে তীব্র একটা একটানা শব্দ করে হেলে গিয়ে গাড়িটা কি ভয়ই দেখিয়ে দিয়েছিলো। আসলে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি, উপরেও উঠছে সঙ্গে সঙ্গে। গাড়িতে তখন লোকজন ক'মে গেছে। দু-তিন মাইল পরে পরে গোটা দু-এক স্টেশন। যত লোক নেমেছে তত ওঠেনি। নতুন দেশে গেলে সে দেশের মানুষদের মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নতুনত্ব খোঁজা স্বাভাবিক। আর এক্ষেত্রে নতুনত্বও ছিলো। গাড়ির দু'দিকেই যেমন চায়ের চাষ চোখে পড়ছে। তেমনি মেয়েদের কানে বড়ো বড়ো ফুটোয় মোটা মোটা গোঁজ পরানো। নাক মুখের গড়নও একটু ভিন্ন রকমের।

ঠিক এই সময়েই গাড়িটা বিপর্যয় ঘটানোর মতো ক'রে উঠেছিলো। হাত ধ'রে টালটা সামলে দিলো সৌম্য। আর বোধ হয় ছলাৎ ক'রে এক ঝলক রক্ত উঠে পড়েছিলো বিমলার কান পর্যন্ত।

'লজ্জার কি আছে। গাড়িটার এই বিদঘুটে অভ্যাসের কথা জানা না থাকলে ভয় করে।'

'আর কত দূর ?'

'আধ ঘণ্টাটেক লাগবে।'

'আচ্ছা, সৌম্য।'

'বলো।'

'চাকরি যে হবেই তার কি স্থিরতা আছে ?'

'তা আছে ব'লেই মনে করি।'

হাত দু'খানা একেবারে আদুল। বিধবাদের মতো হাত। কিন্তু শাড়িটা নতুনই ছিলো। তাঁতের, মাড়ে খরখরে। খুব হাল্কা জর্দা রঙের বোধ হয় ছিলো। ধারে কেনা। ধারটা অজয়ের নামে হয়েছিলো। এনেছিলো সৌম্য দেবে বিমলাই যদি চাকরি হয়।

'কিন্তু কিছু টাকা দরকার হবে তোমার।'

'কেন ?'

'সংসার করতে হবে তো। আর একটু ভদ্র কায়দায় থাকতেও হবে।'

সেদিন সৌম্যের মুখে দাড়ি ছিলো। আর সেটাই কমনীয় নরম ক'রে রেখেছিলো তার মুখকে। কত চক্রান্ত, কত নিচের টান থাকে চাকরির ব্যাপারে। চাকরি যেন একটা লড়াইএ জিতে স্থিতি লাভ। তাই নয় ? এইটুকু একজন কি পারে সেটাকে জয় ক'রে দিতে ?

'চাকরি পেলে থাকবার বাড়িও পাবে।' বলেছিলো সৌম্য।

'আগে পাই।'

'পাবে দেখে নিও। অজয়বাবু চিঠি দিয়েছেন।'

'সে তো তুমিই লিখিয়েছো।' বিমি বললো।

'আর সোয়েথয়েট বাগানের বড়ুয়া সাহেব তোমার জন্য চেষ্টা করবেন।'

'আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। সৌম্য, তুমি·····তোমার মাথায় যে বুদ্ধিটা কি ক'রে খেলে গেলো যে আমি চাকরি করতে পারি।'

সৌম্য পারে। চাকরির নামটাও ভালোই ছিলো। লেডি ওয়েলফেয়ার ইনস্‌পেক্টর। সোয়েথয়েট বাগানের নারী শ্রমিকদের কিসে মঙ্গল হয় তার খোঁজ রাখা। শ্রমিকদের অনেকেই ছিলো খ্রীষ্টান। বিশেষ ক'রে তাদেরই মঙ্গল করা। চার্চেও যেতে হ'তো শ্রমিকদের নিয়ে। গুঁড়ো দুধ, ভিটামিনের বড়ি বিতরণ করতে হ'তো। ওয়েলফেয়ার অফিসরকে ছাপানো ফর্মে রিপোর্ট দিতে হ'তো।

আর চার্চ। ওদিকে কুয়াশা নামতো। নতুন কেউ গেলে মনে করতে পারতো সবগুলি উনুনে আঁচ দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা হ'তেই অজস্র ধোঁয়াকুণ্ডলী বাড়তে বাড়তে যেন আকাশ ছেয়ে ফেলতো। কিন্তু বোঝা যায় ধোঁয়া নয়। চোখ জ্বালা করে না। কাশি আসে না। ভালো লাগে। মনে হবে সন্ধ্যারই ব্যাপার। কিন্তু সকালে দেখো আকাশ থেকে মাটি সবটুকু ফাঁক ভ'রে ফেলেছে। সাদা মেঘ। সাদা নয় ঠিক, হাল্কা নীল। আর চা গাছের কোঁকড়ানো মাথাগুলোতে যেন জড়িয়ে যেতো। উপরের আকাশ পরিষ্কার হয়। গাছগুলোর ডালপালা ফুটে ওঠে, তবু যেন চা গাছের মাথাগুলোতে জড়িয়ে থাকে কুয়াশা।

আর সেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সাদা চার্চটা ফুটে উঠতো। মেথডিস্ট চার্চ। উঁচু গির্জার দিকে ঢালু পথ বেয়ে একটা একটা দল উঠছে মানুষের। ···স্টিপ্‌ল্ না স্পায়ার?

সৌম্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলো বিমি, 'কি বলে ওকে মনে পড়ছে না। আমাদের কিন্তু এক কালে এ সবের তফাৎও শিখতে হ'তো।'

অবাক হয়নি সৌম্য। বোধ হয় তার চাইতেও অবাক হওয়ার আর একটা কারণ হাতের কাছে ছিলো তার তখন। বিমি চুল কেটে ফেলেছে। কাঁধ পর্যন্ত থলো থলো চুলের দিকে সৌম্য হাঁ ক'রে চেয়েছিলো।

'তুমি তো চার্চে যাবে না।' বিমি বললো।

'না। অতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকা পোষায় না।'

'আমি চলি। ওরা এগিয়ে গেছে। তুমি কি এখানে থাকবে আজ?'

'গত সপ্তাহ থেকেই আছি।'

'তাই নাকি?' হাসি হাসি মুখে অবাক হ'লো বিমি।

'হ্যাঁ একটা দোকান দিয়েছি।'

স্টিপ্‌ল্, না স্পায়ার? লাল পাথরের, অন্তত লাল পাথরই বেশী, টিলার উপরে সাদা গির্জা। তীক্ষ্ণ চূড়ার তীক্ষ্ণতা কমিয়ে ছোট ছোট ক্রশ।

সৌম্য বেশ কথা বলতে পারতো। কিন্তু স্বভাবটা তার কেমন ছিলো? বুঝি না, বুঝি না।

'কি বুঝতে পারছ না?'

গাড়িটা দুলছে। উপরে উঠছে ব'লে যত শব্দ হচ্ছে ততটা যেন এগোচ্ছে না।

'নিজেকেও।' বললো বিমি।

'আর আধ ঘণ্টা সময় আছে। ততক্ষণ নিজেকে বুঝে নিতে পারো। গাড়িটা একটা টানেলের মধ্যে ঢুকবে। অন্ধকার হ'য়ে যাবে। ভয় কোর না। আর ভয় যদি না করো, তা হ'লে নিজেকে ধীরে সুস্থে বুঝবার চেষ্টা করতে আর বাধা কোথায়?' সৌম্য হেসেছিলো।

কথাটা সৌম্য ভালোই বলতো।

'তা হ'লে শোনো, বলি।'

'কেন বলবে? চাকরি একটা জুটিয়ে দিচ্ছি ব'লে।'

'শোন আমি পালিয়েছিলাম কেন বজ্রযোগিনী থেকে।'

সেদিনই সুরথের গল্পটা বলেছিলো সৌম্য। বিমির বজ্রযোগিনী থেকে পালানোর কথা শুনেই কি সুরথের কথা মনে হয়েছিলো সৌম্যর? না সুরথের কথা শুনেই বিমিরও ইচ্ছা হয়েছিলো নিজের কথা বলতে? একই সঙ্গে দুটো গল্প আলোচনায় এসেছিলো। পাশাপাশি চ'লে চ'লে উপসংহারে একই সুরে মিলে গিয়েছিলো।

'বুঝলাম বজ্রযোগিনীতে থাকা অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো তোমার।'

তা হয়েছিলো, ভাবলো বিমি। এবার ভাত বসাতে হবে। কটা বাজলো কে জানে। ভাজাগুলো কুটে নিতে হবে। ডালে ঠিকই নুন দেয়া হয়েছে। নুনের বাটিতে আঙুলের দাগ রয়েছে। সেটা কাল রাত্রির নয়।

অসহ্য হয়েছিলো বজ্রযোগিনীর স্থিতি। কেন? মরণচাঁদ বেরিয়ে এসেছিলো কিছু একটাকে বাঁচাতে। কি সেটা? তাকে কি বাঁচাতে পেরেছে? আর বজ্রযোগিনী? যদি বলো এক দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে ভুবনবাবুকে বাঁচাতে এবং নিজেকে বাঁচাতে সে কলকাতা যাত্রা করেছিলো, তবে ফিরে এসে এই অবস্থানটাকে কি বলবে? কি বলা যায়?

ভুবনবাবু স্কুলে গেলো।

আজ বিমির স্নানও হয়নি সকালে। সকালে উঠতে দেরী হয়েছিলো। শীত শীত লাগছিলো শরীর খারাপ হ'লে যেমন হয়।

কাপড় গামছা হাতে নিয়ে সাবানের কথা মনে হ'লো। ভুবনবাবুকে বলেনি সে। বলতে কুণ্ঠিত হওয়ারই বা কি যুক্তি? আজ সন্ধ্যা বেলাতেই ব'লে দেবে। সংসার করতে ব'সে প্রয়োজনের এক টুকরো সাবান না চাওয়াটাই তো হাসির ব্যাপার হ'তে পারে।

কাজ অবশ্য অনেকই আছে। ভুবনবাবুর জামা কেচে রাখা হয়েছে, ইস্ত্রি করা হয়নি। চালের কাঁকর বাছা তো আছেই। কয়েক গজ কাপড় কেনা আছে। দেখতে হবে বালিশের ওয়াড় কিংবা পেটিকোট কোনটা করলে আয় দেবে।

খেতে খেতে সে ভাবলো রান্না ঘরের ঝুল ঝাড়া হয়নি দেখছি অনেকদিন। তাকের উপরে রাখা মশলাপাতির কৌটাগুলিতেও ময়লা জমেছে। সোডা আনিয়ে নিতে হবে।

একটা গোলমাল হচ্ছে যেন পথে। এমন একটা বড় রাজপথের ধারে বাড়ি করলে এ সইতেই হবে। রেললাইনের ধারে যারা বাস করে গাড়ির শব্দ না শুনে তাদের উপায় কি?

খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার মনে হ'লো গোলমাল নয়, কে যেন ডাকছে।

'দাঁড়াও, আসছি।'

দরজা খুলে বিমি অবাক হ'লো না বটে কিন্তু একেবারে সাধারণ ভাবেও গ্রহণ করতে পারলো না।

'কি খবর সোদামুনি ?'

'আর চারদিন পরেই যাওয়া।'

'কিন্তু তোমরা তো যাবে না শুনলাম।'

'কি জানি কি হবে!' ঢোক গিললো সোদামুনি।

'বসবে? না কি আর কিছু পরে আসবে? কাজকর্ম কিছু সেরে নেই তা হ'লে?'

'বসি না। একটু বাজারে যাবো। কান্তর বউ চারটে পয়সা দিয়ে একটু আচার আনে দিতে কলো।'

'ও।'

'তা, মা ঠাকরুণ, তোমাকে যা কওয়ার ক'য়ে যাই। মোহিতবাবুকে চিনতা? তেনি বুঝি গল্পে গল্পে তোমার কথা তাকে কইছে। তা মোহিতবাবু আজ ক'লো সোদামুনি তোমাদের মা ঠাকরুণকে একটুক ডেকে আনতে পারো?'

'আমি?'

'তোমাকেই যাতে কইছে। যায়ো, কেমন?'

'যাবো?'

'তা যদি কও ফেরার পথে তোমাকে ডাকে নিয়ে যাবো।'

'আচ্ছা। তাই যেয়ো।'

দরজা বন্ধ ক'রে কাজ করতে গেলো—বিমি। চাল বাছাটাই সব চাইতে আগে দরকার। মোহিত অবশ্য···। মোহিতকে কোন সান্ত্বনাই সে দিতে পারবে না। সান্ত্বনাই সে চায় এমন কোন কথাও নয়। হয়তো দণ্ডকারণ্যর স্রোতে ভেসে যাওয়ার আগে পুরনো পরিচিত হিসাবে দেখা করতে চায়। গেলে ক্ষতি নেই। শুধু মোহিত নয়, সুরথরা রয়েছে, ওদিকে শ্রীকান্তরা।

কিন্তু কেমন লাগবে এতদিন পরে আবার ক্যাম্পের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়তে? প্রায় দু'বছর হ'লো, কিছু বেশীই হবে। সেই বন্যা নেবে যাওয়া কাদায় আচ্ছন্ন ক্যাম্পে আর সে ফেরেনি।

আবার ডাকলো সোদামুনি।

'এত তাড়াতাড়ি?'

'সামনেই পানের দোকানে পাওয়া যায়। দু'পয়সার আচার কিনতে আর কতটুকু। যাবে?'

'চলো।'

ক্যাম্পের সদর দরজা পার হ'য়ে সোদামুনির পিছন পিছন ক্যাম্পের ভদ্র-পাড়ায় এসে দাঁড়ালো সে। এতক্ষণে সে মুখ তুললো। তাঁবুগুলো দেখে চিনতে পারবে কোনটা কার, এমন হয় না। বন্যায় ওলোট পালোট হয়েছে তা ছাড়া মাঝে মাঝে কিছু পরিবর্তন হ'তো স্বাভাবিক ভাবেই। কেউ চ'লে গেলে সেই ফাঁকা জায়গায় অন্য কেউ তার তাঁবু নিয়ে গিয়ে বসেছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়।

সোদামুনি ঘুরে ঘুরে চললো। ক্যাম্পের কর্তা অজয়ের কোয়ার্টার্সের পাশ দিয়েই যেন মোহিতের তাঁবুতে যাওয়ার রাস্তা। অ্যাম্বুলেন্স? লাল ক্রশ আঁকা সাদা রঙের গাড়ি। লোকজন নেই গাড়ির কাছে।

চিন্তাটা একটা কল্পিত আশঙ্কার রূপ নিয়ে এলো। যেতে চাইবে না এরা, দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে—সে জন্য?

মোহিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে বিমি দেখতে পেলো সুরথকে। এতটুকু বদলায়নি সুরথ। এক যদি মাথার চুলগুলো একটু বেশী সাদা হ'য়েছে বলা না যায়। বিমি হাত তুলে নমস্কার করলো, থেমেও দাঁড়ালো। সুরথ প্রতিনমস্কার জানালো কিন্তু যেন চিনতে পারলো না বিমিকে। দু'বছরে সে কি খুব বদলে গেছে নাকি? সুরথবাবু আবার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো।

মোহিতবাবু শুয়েছিল বিছানায়। ক্যাম্পে থাকবার সময়ে মোহিত-বাবুর তাঁবুতে দু'একবার আসতে হয়েছে বিমলাকে। লতা আনতো ডেকে। তখনও সে লক্ষ্য করেছে মোহিতবাবু তার বিছানায় ব'সে কিংবা শুয়ে বই পড়ছে। ক্যাম্পের গ্রন্থাগারের বাইরে মোহিতবাবুকে ভাবতে গেলে এ দৃশ্যটাই মনে পড়ে। আশ্চর্য ব্যাপার দেখো মনের।

তাঁবুতে ঢুকতে গিয়েই তার মনে পড়ে গেলো গুহগিন্নীর সঙ্গে প্রথম যে সন্ধ্যায় সে এসেছিল। ছি-ছি, লতা হয় তো মনে করেছিলো মাফলারটার জন্য সেও গুহগিন্নীর আক্রমণকে সমর্থন করে।

পায়ের শব্দে মোহিতবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলো। অনেকটা রোগা দেখালো তাকে। বিশেষ ক'রে মুখটি যেন ভয়ানক বিবর্ণ।

'কে, সৌদামিনী দিদি?'

'হ্যাঁ, বাবু, মা ঠাকরুণকে নিয়ে আলাম।'

'মা ঠাকরুণ? বিমলা! ও। ঐ টুলটা একটু টেনে দাওনা, দিদি। বসুন।' মোহিত মৃদু স্বরে কথা বলছিলো। একটা বিবর্ণ হাসি দেখা দিলো তার মুখে।

বিবর্ণ হওয়াটা দোষের নয় বোধ করি। লতার ঘটনার মত ঘটনা যার ঘটে তার সব কিছুই বর্ণহীন হ'য়ে যায়। নাকি, সে জন্য নয়? বিমি যখন ক্যাম্প ছেড়েছিলো তার পরও এদের উপর দিয়ে ক্যাম্পের দু'বছরের জীবন প্রবাহিত হ'য়ে গেছে।

বিমি বসলে সোদামুনি বললো, 'আমি পরে আসে নিয়ে যাবো মা ঠাকুরুণকে।'

'তাই কোরো।'

বিমি বললো, 'ভাল আছেন, মোহিতবাবু?'

'আছি এক রকম।'

বিমি জিজ্ঞাসা করলো, 'যাচ্ছেন নাকি?'

'কোথায়, দণ্ডক বনে? না। আপনাকে ডেকে না-পাঠালেও হ'তো। দয়া ক'রে এসেছেন, এ জন্য মনে মনে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের দয়ার সীমা নেই। লতুও দয়াবতী। তার দয়ার তুলনা নেই।'

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কি সমীচীন হ'লো? লতার কথাই যদি উঠে পড়ে কি উত্তর দেবে সে। সোদামুনিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, অবিশ্বাস করার কিছু নেই-ও, স্বামীত্যাগিনী লতার কথা বলতে গেলে কেলেঙ্কারির কথাই মনে হ'তে থাকবে।

কিন্তু মোহিতবাবুর শেষ কথাটা কি শ্লেষ? তীব্র একটা বিদ্রূপ নারী জাতির উদ্দেশ্য? কিংবা আর একটা আত্মপ্রবঞ্চনা? মোহিতবাবুর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মোহিত বললো, 'লতু আমাকে ব'লে গেছে সে আপনার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার ব'লে চেয়ে নিয়েছিলো। সে টাকাটা আজ আপনি নিন। সৌদামিনী দিদির কথায় হঠাৎ জানতে পারি আপনি এখানেই আছেন। নতুবা ধার শোধ করা কি হ'তো? কিন্তু ধার শোধ করাই নয়। বিশ্বাস করুন, বড্ড দেখতে ইচ্ছা হ'লো আপনাকে।'

হঠাৎ মোহিত কাশতে সুরু করলো। যা সে বলছে তার চাইতে অনেক গভীরের কোন আবেগ চাপতে গিয়েই হয়তো এমন হলো। বেদম হ'য়ে বুক

চেপে ধরলো। লাল হ'য়ে উঠলো তার বিবর্ণ মুখ। শিয়রের কাছে গামলা ছিলো। চোখ সরিয়ে নিলেও ব্যাপারটা চোখে পড়লো বিমলার। শিউরে উঠলো সে।

'কত দিন থেকে অসুখ?'

'অনেকদিন। লতু অনেক সহ্য করেছে। অনেক ভিক্ষা করেছে সে আমার জন্যে।' মোহিতের চোখে জল এলো যেন।

'আবার কাশি আসবে আপনার মোহিতবাবু। আমি...'

'এই শেষ। আমরা ছড়িয়ে পড়লাম আবার। কেন জানি না বড্ড ভালো লাগে আপনাদের। আপনি, অজয়, সৌম্য, সুরথ, লতা; সবাই আপনারা ভালো। কত ভালো!'

'আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা—'

'অনেক যুদ্ধ করেছে লতা। প্রথমেই গায়ের গয়না খুলে দিয়ে সুরু...। বড়ো দুঃখী মেয়ে লতা। সারা জীবনই সে দুঃখ সহ্য করেছে। যাকৃগে। ছড়িয়ে পড়লাম আবার সবাই, এই দুঃখ। আপনাকে যে মুহূর্তের জন্যও ফিরে পাবো এ আর ভাবিনি। সৌম্যর সঙ্গে আর দেখা হ'লো না। আর ওদের পরিবারটা। গুহকর্তা মারা গেছেন। গিন্নী চ'লে গেছেন কোথায় কোন মেয়ের বাড়িতে। সৌম্য বড় ভালো ছিলো, কিন্তু একটু নির্দয়ও ছিলো বোধ হয়।'

'আপনি আর কথা বলবেন না, মোহিতবাবু।'

'সে জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনাদের আমি বড্ড ভালবাসি, এ কথাটাই বারে বারে বলতে ইচ্ছা করে। আর লতু। তার তুলনা হয় না। আমার স্ত্রী ব'লে বলছি না। কি ক'রে বোঝাবো। একটা জেদ ছিলো তার। রোগ রোজ ক্ষয় করছে, আর সে যেন থাবা থাবা মাটি তুলে সেই ক্ষয় ঢেকে দিচ্ছে। আমার এই দেহটা কতখানি লতুর স্নেহ দিয়ে গড়া, ভাবতে গেলে অবাক হ'তে হয়।

একটু বিশ্রাম ক'রে নিলো মোহিত।

বললো, 'দণ্ডক বনে ওরা যাবার আগেই আমি যাবো ক্যাম্প থেকে। বিদায়।' থামলো মোহিত। ভাবলো। কিছু যেন বলবে। বললো আবার—'বিদায়।'

সোদামুনি এলো।

মোহিত বললো, 'এসেছ দিদি, এবার মা ঠাকরুণকে পৌঁছে দাও। টাকা ক'টা আপনি দয়া ক'রে নিয়ে যান। লতু সাধারণত হাতপেতে চেয়েই নিতো। ধার খুব একটা করতো না। কয়েকটা ধারের কথা আমাকে সে বলেছে—তার মধ্যে আপনার একটি।'

মোহিতের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো বিমলা। আবার মোহিত কাশছে। কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করলো বিমলা, অথচ মনটা তার হঠাৎ যেন শূন্য হ'য়ে গেলো। সে কি কাঁদবে? কারো জন্য কি তার কাঁদা উচিত এখন?

কিন্তু সম্মুখেই সুরথের তাঁবু। তাঁবুর দরজার পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনি ক'রে আবার এসে দাঁড়িয়েছে যেমন বিমি তাকে দেখে গিয়েছিলো। ভঙ্গিটাও বদলায়নি।

এবার বিমি তার দিকে এগিয়ে গেলো, 'কি করছেন সুরথবাবু?'

'যেতে হবে। বাঁধাছাঁদা করছি।'

দরজা দিয়ে সুরথের তাঁবুর ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। তোলা উনুনে রান্না করছে এখন সুরথের স্ত্রী। তাঁবুর ঠিক মাঝখানে বাঁধা প'ড়ে আছে কতগুলি পুঁটুলি। এমন হ'তে পারে পুঁটুলি বাঁধবার তাগিদেই রান্না চড়াতে দেরি হয়েছে।

'দেরি আছে তো যাওয়ার।'

'যেতে যখন হবেই। আপনি বিমলা না?'

'চিনতে পারলেন?' বিমি হাসলো।

'দেখুন নানা রকমের লোক নানা উদ্দেশ্যে ঘোরে। রাজনীতি করছে একটি মেয়ে ক্যাম্পে ঢোকে। তাই যদি হয় তা হ'লে কি গোয়েন্দাও আর লাগেনি সরকার থেকে!'

'অসম্ভব কি?'

'একটা কথা বলি। এদিকে আসুন।'

তাঁবু থেকে একটু সরে দাঁড়ালো সুরথবাবু।

'আপনি মোহিতবাবুর ঘর থেকে এলেন তো?' সুরথ বললো।

'হ্যাঁ।'

'এটা কি ভালো? অ্যাম্বুলেন্স দেখছেন। ওটা আনিয়েছে অজয়। অসুখই যদি তবে এতদিন হসপিট্যালে গেলেই হ'তো। ঠিক এখন যখন

দণ্ডকারণ্যে যেতে বলেছে সরকার থেকে তখন অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে হসপিট্যালে যাওয়া কেন?'

'সত্যি অসুখ তো মোহিতবাবুর।'

'অসুখ মিথ্যা তাতো বলছি না। ছ'মাস আগে যা ছিলো এখন হয়তো একটু বেড়েছেও। যখন দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার কথা ছিলো না তখন তো অ্যাম্বুলেন্সের কথাও মনে হয়নি। দণ্ডকারণ্যে যেতে না হ'লে এখানেই থাকতো না মোহিত? এটা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে না দণ্ডকারণ্যকে? আর অজয়ও যেন কেমন হয়েছে আজকাল। ভাব দেখাচ্ছে অসুখটা যেন হঠাৎ হয়েছে। অথচ লতা যাওয়ার পর থেকেই তো অসুখ জানাজানি, সে তো এক মাস হ'লো। বলুন, একি কারো বুঝতে বাকি থাকে দণ্ডকারণ্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এই অ্যাম্বুলেন্স ডাকা।'

বলতে বলতে সুরথের মুখটা রক্তহীন হ'য়ে গেলো।

'অজয়ের কাছে যাচ্ছেন?'

'আছে নাকি কোআর্টার্সে?'

'তা আছে বোধ হয়। বিকেলে যাবে মোহিত।'

বিমি অজয়ের কোআর্টার্সের দিকে হাঁটতে লাগলো।

'তুমি যাও, সোদামুনি। আমি একাই যেতে পারবো।' এই ব'লে সে বিদায় দিলো তাকে।

এতদিনে যেন বোঝা যাচ্ছে মোহিতের অদ্ভুত আভিজাত্যর ভাবটার গোড়ায় কি। কেন তার বই পড়ার বিলাস। কেন মোহিতবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকে, আর বউ খেটে মরে।

অজয় তার ঘরে ব'সে খাতা দেখছিলো হিসাবের।

বিমিকে দেখে একটু দ্বিধা ক'রেই বললো,—'মাই···। আপনি? এতদিন পরে কোথা থেকে আবার? ক্যাম্প কিন্তু এবার সত্যি ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

'ক্যাম্পে থাকতে আসিনি আবার।' বিমি একটা বিবর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুললো।

'না না। ও কথা নয়।' অজয় লজ্জিত হ'লো। 'বলুন কি খবর। বসুন। লোকে যাই বলুক, আমি, আপনি, মোহিত, সৌম্য, সুরথ, লতা—একটা বন্ধুত্বই ছিলো আমাদের।'

'মোহিতের কাছে এসেছিলাম।'

'আ মোহিত। স্যাড্। ও এই শহরেই থাকতে চায়। অ্যাম্বুলেন্স আনানো হয়েছে। বোধ হয় তা হ'লে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্মই দু'এক ঘণ্টা পরে যেতে চেয়েছে। এখুনি হয়তো তা' হলে যাত্রা করবে।'

'সুরথবাবু···'

'হ্যাঁ, সুরথ মোহিতের এ ব্যাপারটাকে সমর্থন করবে না। মোহিত আগেই যেতে পারতো হসপিট্যালে। যায়নি। আশা ছিলো নাকি লতু ফিরবে? আর এখন যখন চ'লে যেতে হবে, এই শহরের থেকে যেতে চাচ্ছে না। হাস-পাতাল হ'লেও লতুর সান্নিধ্য নাকি? স্যাড্।'

'অসুখটা প্রকাশ করলে হয়তো······'

'তা কোনদিনই করে নি। দু'জনে মিলে সেটাকে লুকিয়ে রাখতো। সমাজের বাইরে ভেসে যাবার ভয় হয়তো।'

'লতা···'

'লতু। আমি তাকে লতুই বলতাম মোহিতের অনুকরণ ক'রে। হ্যাঁ লতু। জেদী মেয়ে। জেদী লোকের যা হয়। এক চোখো হয় তারা। আজকাল উপন্যাসে অনেক পড়া যাচ্ছে। যাক্‌গে। আপনার খবর বলুন।'

'দেবার মতো কিছু নয়।'

'সময় থাকলে আপনার কর্তার সঙ্গেও আলাপ করতাম।'

'তা—'

'আর মাত্র চারদিন। এখন আর এ শহরে নতুন কারো সঙ্গে আলাপ করতে চাই না। উঠছেন? আমিও উঠি। দেখি মোহিতকে রওনা ক'রে দিই। অ্যাম্বুলেন্সকে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবো।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার। হ্যাঁ। আর সৌম্য বুঝলেন, সে থাকলে···অবিশ্যি ওটা আমার কল্পনা। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো ও এই ক্যাম্প নিয়ে যেদিকে খুশি চ'লে যেতে পারতো।' অজয় বললো।

ক্যাম্প থেকে বেরুতে হবে এবার। ভদ্রপাড়া থেকে সোজা তারের বেড়ার কাছে গিয়ে বেড়ার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে দরজা দিয়ে।

একটি মেয়ে বারোয়ারি কলগুলোর একটিতে জল পাম্প করছে। জল না ওঠার ফাঁপা শব্দ যেন শুনতে পেলো বিমি। প্রকৃতপক্ষে শুনতে পাওয়ার কথা নয়। পাম্প করতে গিয়ে মেয়েটির কোমর থেকে মাথা অবধি ওঠানামা করছে।

ক্ষীণধারায় জল এলো কি এলো না। কা—কা—কা। ঝটাপটি করলো দু'টো কাক। সোদামুনি। অবশ্য লতু…। হ্যাঁ লতাই তো।

এমন মেয়েকে কল্পনা করা যায় যে শরীর আর মনকে পৃথক ক'রে ফেলেছে। শরীরের যাই হোক, মন গৃহমুখী। টাইপিষ্ট আঙুল দিয়ে টাইপ ক'রে টাকা কামাই করলে যদি দোষ না হয়—আঙুলও তো দেহই। তাই কি নয়? এই ভাবতে চেষ্টা করলো বিমি।

'তুমি? আমি ভাবি আর কে হয়।' পাশের দিকে তাকালো বিমি।

'মা ঠাকরুণ,'

'কিছু বলতে চাও, সোদামুনি?'

'আমরা যাবই না দণ্ডকারণ্যে।'

'মন ঠিক হ'লো তোমাদের?'

'অবিমন্যু।'

'ও। তার কি হ'লো?'

'তেনি কয় মাসি পলাইছে। এখন এ ছেইলে নিয়ে কি করা?'

'পালিয়েছে!'

'কাল থিকে দেখা নাই।' একটু থেমে সোদামুনি বললো, 'বিশ বছর আগে থিকেই মাসি চা-বাগানের বাবুর কাছে থাকতো। সে বাবু মরেছে আজ পাঁচ বছর। সে বাবু নাকি তেনির গাঁয়ের। অনেককাল গাঁ ছাড়া। তা হউক। এ ছেইলে যদি চুরি করা না হয়, কি কইছি। পুলিসের ভয়ে পলাইছে। ছেইলে নিয়ে ভিক্ষে করাই মাসির কাজ। আজ এ ছেইলে কাল আর একটা। চালান হয় নাকি ছেইলে?'

'এ সব কি কথা? বলছো কি? মরণচাঁদ বলেছে?'

'তেনি কয় এ কোন ভদ্রলোকের ছেইলেই হবি। এমন মুখ, আর এমন চোখ। তা যদি হয়, ভালোই। ওকে বাঁচান লাগে। আর যদি পুলিস ওর বাপ-মাকে খুঁজে বার করে, তবে নিয়ে যাও ছেইলে তখন। তৎক্ষণ?'

পায়ে পায়ে বিমির দরজা পর্যন্ত সোদামুনি এলো।

একটা নকল কিছু যেন পেয়েছে মরণচাঁদ, ভাবলো বিমি। নকল কিন্তু স্নেহ দেয়ার, সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রক্ষা করার কিছু। এবার কি নিজের মধ্যে কাউকে খুঁজে পাবে?

কথাটা বিমলা হঠাৎ শুনেছিলো—শুনে ফেলেছিলো। 'চোখ দুটো দেখো

না সোনার তৈরী। কালো নাকি সকলের মতো? তা নয়। মা ঠাকরুণ, বলি কি অমনি? তা দেখো সেদিন যে বক্তিমা শুনলে চরনিগুন্দির হাটে নেতা মহারাজের, সেই কথা। আমাদের জেতের মধ্যে তো ভালো কিছু আছে। তাকে বাঁচায়ে বাঁচায়ে যাতে হবি। তারপর একটু তিথু হ'তে পারলি যাকে বাঁচায়ে রাখছি সেই আবার জেতেক প্রাণ দিবে। তা ধরো আমার মা ঠাকরুণ তো তেমন কিছু হোবের পারে। চোখ দেখেই মনে হয় আমার তোমার ঘরের নয়।'

মরণচাঁদের মুখে তখন একটা প্রাচীন গাম্ভীর্যই দেখা দিয়েছিলো। তার দল তখন চরনিগুন্দি চাকদা সড়কে ঝপাঝপ কোদাল মারছে। রাস্তা হবে। বিনিময়ে এই যাবাবর উদ্বাস্তু দল চাল পাবে আর সপ্তাহে নগদ আট আনা। নকল কিছুর উপর যেন মরণচাঁদের একটা টান আছে। নকল নাকি কথাটা?

বিমি চোখ নামালো। সোদামুনি যেন তার চোখ দু'টিকে আজ প্রথম দেখলো। আর দেখে অবাক হ'য়ে যাচ্ছে।

কার চোখ কেন কেমন হবে? এমনই ছিলো হয়তো কারো তার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে।

সোদামুনি বললো,—'মাসি কয় ছেইলে কুড়ায়ে পাওয়া। পেত্তয় হয়না। ছেইলে কি গাছের ফল, কুড়ায়ে নিলে হ'লো? চুরিই। বুক কাঁপে, মা ঠাকরুণ। সোবাস কোথায় গেলো? আর তার দাদাও যতি যায়? তার আগে আমার মরণ নাও হোবের পারে।'

গলাটা কাঁপলো সোদামুনির।

'আচ্ছা সোদামুনি, এখন একটু কাজ করি, পরে এক সময়ে কেমন?'

সোদামুনি চলে গেলো।

তালা খুলে বিমি ঘরে ঢুকলো। বেলা পড়ে গেছে। আজ আর কাজ হবে না। ভুবনবাবুর ঘরটাই বরং দেখে আসা যাক গোছানোর দরকার আছে কিনা।

অবশ্য সোদামুনিকে সে বসতে বলতে পারতো। কিন্তু একটা অব্যক্ত আবেগের চাইতে আর বেশি কি? একটা কষ্টই যেন।

টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো বিমি। আয়নাটা শোয়ানো ছিলো। তুলে দিলো। পিছন ফিরে বিছানাটায় চাদরটা একটু টানটোন ক'রে দিলো। একটা বেডকভার দরকার। আবার ফিরলো। আয়নাটা তুলে নিলো সে। চুলের

কথা আর ব'লোনা। কারো কারো কত যত্ন করতে হয়, দু-একটি কয়েল তৈরি করতে। আর কপালের উপরে সিঁথি যেখানে ভাগ হ'য়েছে এখনো সেখানে দু-তিনটি কয়েলের মতো ঢেউ দেখা যায়। আয়নাটা নামিয়ে হাতের বালা দুটিকে দেখলো। আয়নায় চোখ দুটো খানিকটা ধোঁয়াটে রঙের। ধোঁয়াটে নয় বোধ হয় জর্দা রঙের। নাকি সোনালী?

আবার আয়নার দিকে ফিরলো সে।

চুল সে নিজের হাতেই কেটেছিলো। কাটা মুশকিলও। একদিনে হয় না। পিঠ থেকে কুড়িয়ে বুকের উপরে এনে সমান করা ডগাগুলো কেটে দিতে পেরে তার সাহস হয়েছিলো। লম্বা চুল ছোট করতে করতে এক সপ্তাহের প্রসাধনে কাঁধের কাছে উঠেছিলো চুল। আর সাবান দিয়ে দিয়ে দু'বছরের ময়লা যেন সে দূর করেছিলো ক্রমাগত এক সপ্তাহের চেষ্টায়। তারপর একদিন চিরুনি দিয়ে কপালের উপরে কয়েল করে দিলো চুল।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে চারখানা শাড়ি কিনলো সে। বিছানাটাকে সুন্দর করলো। একটা ছোট বেতের টেবিল কিনলো। টেবিলে টুকিটাকি সাজানোর জিনিস দিয়ে সাজালো। আর সেটা আবিষ্কার। মনে হয়েছিলো আবর্জনা রাখবার কিছু। কিন্তু কুলি লাগিয়ে পুরনো ভাঁড়ারের ময়লা সাফ করিয়ে সে যখন বলছে ওটাকেও বিদায় করো, কুলিরাই উল্টে পাল্টে দেখে বলেছিলো ভালোই আছে। মরচে-পড়া বটে। কলাই উঠে গেছে এখানে ওখানে। ময়লা লেগে লেগে এমন হ'য়েছে হাত দিতে ঘৃণা করে। কিন্তু কুলিকেই বলেছিলো সোডা কিনে নিয়ে আয়। গরম জল দেবো। সাফ ক'রে দে। চা বাগানের কুলি। বাথটাব। পুরনো। জায়গায় জায়গায় কলাই চ'টে যাওয়া। তা' হ'লেও সাদা ধবধবে এনামেল করা বাথটাব। একদিন বাসায় ফিরে এক ডেকচি গরম জল ক'রে নিয়েছিলো। ঠাণ্ডায় গরমে মিশিয়ে কবোষ্ণ এক বাথটাব টইটুম্বুর জল। সেই বাথটাবে কাঠের বেড়ার কাঠের পাটাতনের স্নান ঘরে আবগাহন করেছিলো। গাহন গাহন গাহন। জলকে দেখা। জলকে অনুভব করা। নিজেকে দেখা। নিজেকে অনুভব করা। প্রতীক স্নান।

নীল, নীল কুয়াশা। তোমার চোখ দুটি নীল—বলেছিলো সৌম্য।

সাজানো সাজানো চা গাছ। বেল কুঁড়ির মত সাদা সাদা ফুল। নীল

কুয়াশা গাছের পাতা থেকে টুপটুপ ক'রে শিশির হ'য়ে পড়ছে। যদিও দুপুরের কাছে গেলো বেলা।

এদিকে কলের লাঙ্গল চলছে। লাল কলের লাঙ্গলের উপরে কালো টুপি পরা ড্রাইভার। বাদামী ঘাসে ঢাকা প্রান্তর উল্টে উল্টে কালো মাটি বেরিয়ে পড়ছে। ধোঁয়া উঠছে যেন উল্টে যাওয়া মাটি থেকে। কাছে গেলে গন্ধও পাওয়া যাবে।

বাঁ হাতটাকে সোজা মেলে দিয়ে সামনের দিকে সরিয়ে আনতে থাকলে যে-দিকটা অনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয় সেখানেই চাষ হচ্ছে। হাতটাকে পিছন দিকে নিলে যে দিক সেখানে এক বুক উঁচু ঘাস। বাতাসে হিল হিল ক'রে কাঁপে ঘাসের ডগা। জোর বাতাস হ'লে জলের মতো তরঙ্গে মাতামাতি করে ঘাসের বুক। সামনে ঘাসে ঢাকা লন। লনের পরেই হসপিট্যালের ম্যাটার্নিটি ওআর্ডের কাচের জানালা। ডানদিকে প্রান্তর। একটা টিলা। বড়ো বড়ো পাথরের মধ্যে দিয়ে গড়ানে সবুজ জমি টিলার দিকে উঠে গেছে। এই টিলার উপরে চার্চ। সাদা রঙ। কালো ক্রুশে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অকাশকে পবিত্র করেছে। যাবার পথ ওদিক দিয়ে। হসপিট্যালের সামনের দিক ঘুরে বাগানের বাবুদের পাড়া, কলঘর, সাহেব পাড়া দিয়ে রাস্তা ব'য়ে টিলায়।

চোখ সরিয়ে আনতে আনতে হসপিট্যালের কাচের জানালা ছুঁয়ে প্রান্তর দিয়ে লঘু পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে কৃষ্ণচূড়া গাছটা। থলো থলো লাল ফুল। দুপুরের দমকা বাতাস গাছটার নিচেকার সুরকির পথের লাল ধুলো ওড়ায়। ঘূর্ণিপাক লাগে। বাতাসগুলো মাঝে মাঝে পাতা উড়িয়ে ঘূর্ণিপাক তৈরি করে। সর সর ক'রে ঝরা পাতা টেনে নিয়ে কোনদিন ঘাসের জঙ্গলের উপর দিয়ে তরঙ্গ তুলতে তুলতে চ'লে যায়। অন্য কখনো হসপিট্যালের কাচের জানালা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ঝন ঝন ক'রে শব্দ তুলে থেমে দাঁড়ায়।

দুপুর হ'লো। রবিবারের দুপুর। চার্চ থেকে ফিরে এসেছে। স্নান করেছে। শীতের শেষের টান বাতাসে। শুকিয়ে গেছে চুল ইতিমধ্যে। শাড়িটা উড়ছে বাতাসে। দোয়েল ছিলো বোধ হয় সেটা। বাড়ির সামনে কাপড় মেলার দড়ির খোঁটার উপরে ব'সে শিস দিয়ে দিয়ে লেজ নাচাতো।

কাঠের রেলিং। কাঠের তৈরী বাড়ি। পথ থেকে উঠে আসা কাঠের সিঁড়ি। পথ ঠিক নয়। লনই বরং। অবশ্য ঘাসগুলো সমান ক'রে কাটা নয়।

পাটাতনের কাঠ জায়গায় জায়গায় ফাঁক হয়ে গেছে। কিন্তু তখন বোধ হয় পাটাতনও রঙ করা ছিলো। দেয়াল বোধ হয় সাদা কিংবা নীলাভ ছিলো। আর রেলিং বোধ হয় বার্নিশ করা। পুরনো ব্যবহার করা আসবাবের মতো বার্নিশ চটা রঙ এখন। তা' হোক। তা' হলেও খটখটে। সাবান সোডা দিয়ে ধোয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই তিন মাসে চার পাঁচবার ঝাড় পোঁছ করা হয়েছে। খটখটে পরিষ্কার। এই ধোয়া শাড়িটার মতোই মাড়ে খসখস করছে। পরিচ্ছন্নতার স্বাদ।

কৃষ্ণচূড়া গাছের কয়েকটা পাতাকে গাছের মাথার উপরে পাক খাওয়াচ্ছে বাতাস। অনেকটা দূরে তুলে নিয়েছিলো। এখন আবার পাক খেয়ে নামছে।

রান্নার তাগাদা নেই। ছোট হাঁড়িটাতে মুগের ডাল ফুটছে। নিরামিষ ব্যবস্থা আজ করেছে সে।

'কে? আরে তুমি!'

'আজ এসেছি।

'কোথায় গিয়েছিলে সৌম্য?'

'ক্যাম্পে।'

'তোমার দোকান?'

'চললো না। তুলে দিয়েছি।'

'বেশ করেছো। এখানে থাকো না তা' হ'লে।'

'না, প্রায় তিন মাস।'

'আমার চাকরি ছ' মাসে পড়লো এবার। কি দেখছ? ছ' মাসে কতটা বদলেছি?'

'না, তোমার চুলের কয়েল।'

'আচ্ছা, সে এমন কিছু নয়। তোমার দাড়িগুলো এবার ভাল হয়েছে কিন্তু। কামালেই তোমাকে বুড়ো বুড়ো মনে হয়। আরে, বসবে এসো। গত মাসে নিলাম হয়েছে ম্যানেজারের বাংলোয়। অনেকেই অনেক কিছু কিনেছে। আমি দু'খানা বেতের চেয়ার কিনেছি, কুশনগুলো দেখো।'

'ভালোই আছো তা' হলে?'

'আহ্ সৌম্য, আমি তোমার কাছে, অজয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।'

'এখন বাইরে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?'

'রান্না।'

'রান্না?' হাসলো সৌম্য। 'কৃষ্ণচূড়া দিয়ে নাকি?'

'রোদ এসে গায়ে পড়লো। স'রে বোসো। মুগের ডাল চড়েছে, গন্ধ পাচ্ছ?'

রোদটা ভালো লাগে। ডালটার গন্ধও মিষ্টি?'

'রান্না হ'ক। খেতে দেবো। আচ্ছা সৌম্য,, পরিষ্কার লাগছে না চারিদিক?'

'ঝর ঝরে। ফিটফাট।'

'আর আমাকে? তা সে যাই হ'ক। তুমি আবার আজই ফিরবে নাকি?'

'তা বটে।'

বিমি ফিরে এসে বললো, 'দুজনের চালই ভিজিয়ে দিলাম।'

'আর কে? আমি? স্নান না ক'রে?'

'জলও আছে।'

'সে হবে। তোমাকে ভালো দেখেই খুশি। লোকে তোমাকে চিনেও ফেলেছে। ওলেফার মেম সাহেবের কোআর্টার্স দেখিয়ে দিলো।'

'ওলেফার। ওয়েলফেয়ার। তা কেউ কেউ মেম সাহেব বলে। বোধ হয় চুল দেখে।'

'চোখও।'

'সৌম্য—'

ভুবনবাবুর বাড়ির উঠোনে নামলো বিমি। মাথার উপর দিয়ে অনেক উঁচুতে শ্লথগতিতে বিকেলের মেঘ চ'লে যাচ্ছে। একটা গতি যেন তাদের দেখা যাচ্ছে আজ।

'আচ্ছা সৌম্য, চা বাগানের কাজে রিটায়ার করে মানুষ?'

'তা করে।'

'অবশ্য তার এখনও অনেক দেরি। পঞ্চান্নতে যদি আবার নড়তে হয় এখনও পঁচিশ বছর চাকরি থাকবে।'

'তা থাকবে।'

'বিদায় নেবার আগেই কিছু টাকা জমবে বোধ হয় আমার। বাসা বদলের মতো তাই নিয়ে কোন শহর টহরে একটা ছোট বাড়ি তুলে থাকা যাবে।'

'তুমি অনেক দূর ভবিষ্যৎ ভাবো।' সৌম্য বললো।

'আহ্, সৌম্য।' আড়মোড়া ভাঙলো মাথার উপরে হাত তুলে বিমি। উঠে দাঁড়ালো। 'জল ফুটে গেছে। চা আনি। এখন বিকেল হচ্ছে।'

আর—

'আচ্ছা সৌম্য, সুরথ এখনও আছে ক্যাম্পে?'

'কোথায় আর যাবে?'

'তা বটে। ছেলেকে তো সে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না।'

'মুশকিল।'

'আমার মনে হয়, সৌম্য, আমি এদিকেই আসছিলাম। বজ্রযোগিনী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম এই ঘরখানির জন্যই। এই সোয়েথয়েট চা বাগানেরই অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় কিছুই নয় এটা। কিন্তু তাতে আমার কি এসে যায়? আরামদায়ক, দেখো, এর পরিচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতা। মানুষ কি জানে সে কোথায় গিয়ে থামবে? কিন্তু তার থেমে দাঁড়ানোর জায়গা তো আছেই। এই আমার সেই বিশ্রামের বিন্দু। এই কামনাই ক'রে এসেছি তা কি জানতাম!'

'তোমার উদ্বাস্তু মন এখানে পুনর্বাসন পেলো।'

'তা বলতে পারো। ব'সো আলো জেলে আনি। কি এমন তাড়াতাড়ি?'

'গাড়ি ছেড়ে দেবে।'

'নাই বা গেলে আজ ক্যাম্পে।'

'থাকবো কোথায়?'

'এই বাসায়।'

আলো জ্বালার আগেই বিদায় নিলো সৌম্য। সন্ধ্যা তখন ফেরা পাখির ডাকে এগিয়ে আসছে। প্রান্তরে আলো আছে, বাড়িটার বারান্দায় অস্পষ্টতা। সৌম্য চ'লে যাচ্ছে। আলো পড়ছে তার গায়ে।

অন্ধকার হ'য়ে আসা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বিমি, দু'হাতে দু'হাত জড়ানো, আড়াআড়ি রাখা বুকের উপরে। চারিদিকে থমথমে প্রকৃতির উপরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। বাঁদিকের ঘাসগুলো নড়ছে। অস্পষ্ট খ্যাঁক খ্যাঁক

করলো কেউ। শেয়াল বোধ হয় খরগোসের খোঁজে। ডানদিকে গির্জাটা অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে। আলোটা বারান্দায় টেবিলের উপরে এনেছিলো, কারণ সেখানেই চা এসেছিলো। আলোটা জ্বাললো সে। নিঃসঙ্গ বাড়ির নীরব পরিবেশ। তৃপ্তি, তৃপ্তি। কি একটা জন্তু ভয় পেলো। অন্য কোন জন্তু শিকার ধরেছে। চাপা গরগর শব্দ। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা যেন এই অরণ্যেরই কোন মার্জারী। অনেক আকাঙ্ক্ষায় ক্লান্তির অনেক পথ চলার মার্জার দূরগত। নিঃসঙ্গ মার্জারী মৃদু মৃদু গর্জন ক'রে অগ্রসর হচ্ছে বনপথে। কিছু ক্লান্ত অভিজ্ঞতায় পরিতৃপ্তির আলস্যে লাঙ্গুল দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করছে। নিঃসঙ্গ অন্ধকার। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ অরণ্যের সে ঈশ্বরী।

কান্নার সময়ে যেমন হয় ঠোঁট দুটি যেন তেমনি হ'লো এক মুহূর্তের জন্য বিম্বির।

কিছু একটা করা দরকার। অস্পষ্ট ভাবে তার মনে হ'লো—দু'হাতে তুলে তুলে পাথরের উপরে পাথর সাজানো। ইটের উপরে ইট। প্রাকার কিংবা প্রাচার। বই পড়বে আজ রাত্রিতে। এখন থেকে অবসর সময়ে সে বই-ই পড়বে।

হাতের বালাটার উপরে নজর পড়লো। এখন বিকেল পার হচ্ছে। উনুন ধরানো, লণ্ঠন পরিষ্কার করা ; এ সব কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে সে কাপড় পাল্টাবে আজ ভুবনবাবুর ফিরবার আগেই। আর ক্ষতি কি যদি চুলও আঁচড়ায়? চুলগুলি এখন পিঠের উপরে নেমে এসেছে। খোপাতে জড়ানো যায়।

একটা বাঁধ দেয়া দরকার কোথাও।

মালতী এলো।

'আরে এসো, এসো।'

'এত ভালবেসে ডাকো, বউদি।'

'আসোই না আজকাল দুপুরে। কি ক'রে বেড়াও?'

'আজকাল আমিও তাই ভাবছি।'

'এর চাইতে আমাদের নারীমঙ্গল সমিতি ছিলো ভালো। চলো আবার তাই করি। কাজ, কাজ, কাজ। কিছু ভাববো না।' বললো বিম্বি।

'মন্দ নয়। তা যদি পারা যায়। এমন ক্লান্তি এই বর্তমানের হবে ভবিষ্যতের কথা মনে আসবে না।'

'আর অতীতেরও।' বললো বিমি।

'ভেবে কিছু কূল করা যায় না, বউদি। ওদের শতকরা আশীজন সই করেছে দরখাস্তে। কি হবে?'

দুঃখ হ'লো বিমলার এই ভ্রান্ত মেয়েটির জন্য।

বললো সে, 'কেন আর ভাবি বলো?'

'না ভেবে পাগল হ'য়ে যেতে হবে। মজার কথা শোন।' বললো মালতী, 'অজয়ের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে। সাইকেলে আসছিলো শহর থেকে। আমাকে দেখেই সাইকেল থেকে নামলো। বললো, মালতী না তোমার নাম? তা তুমি আমার উপরে রাগ করেছ ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে হট্টগোল করতে দিই নি ব'লে। আমি নিজে কিছুই বুঝি না। এরা দেশ ছেড়ে এসেছিলো কেন? ধর্মের জন্য? এরা যদি মুসলমান হ'তো, ধর্মান্তরই, দেশ না ছেড়ে ধর্ম? এখানে এসে ধর্মে হিন্দু থাকলেও আর কি কি রাখতে পেরেছে? আর দণ্ডকবনে গেলে তো বাঙালীআনাও গেলো। এখন বলো দেখি বাঙালীআনা বড়ো কিংবা ধর্ম? কিংবা এ দুয়ের চাইতেও আর কিছু বড়ো আছে? কি জানি।'

'অজয় বললো এ সব?'

'হ্যাঁ পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো খেতে খেতে।'

'প্রশ্নটা কঠিন।'

'কিন্তু অজয় আমাকে কোণঠাসাও করেছিলো একটা প্রস্তাব দিয়ে।'

'কি প্রস্তাব? বিয়ের নয় তো?'

'তুমি রসিকতাও করো দেখছি।' হাসলো মালতী, 'তা নয়। বললো, তোমাদের দলের কর্তারাও যেন কি রকম। এই তো হলুদমোহন ক্যাম্পে প্রায় পনেরোটি পরিবার আছে। তারা বলছে, কেটে ফেললেও যাবে না বাংলার বাইরে। তোমরা সকলে মিলে এই পনেরোটির ব্যবস্থা ক'রে দাও না। এই শহরেই তা পারা যায়।'

'তোমার মতো কাজের লোক লাগলে অসম্ভব সাধন করতে পারে।'

'কিছুই পারি না, বউদি।'

'এমন হতাশ হ'লে কেন?'

খানিকটা নীরবতা।

'লতা বউদির কথা আজ শুনলাম।' মালতী আবার বললো।

'কে লতা?'

এই ব'লে বিমি ভাবলো সেও যে ক্যাম্পে ছিলো একথা প্রকাশ পেলে ক্ষতি কি? আলাপে সুবিধাই হয় অন্তত। আর গোপন ক'রে রাখার সতর্কতা থেকে দূরে সরে এসে সহজও হওয়া। কিন্তু তাতে কি অতীত-বর্তমান এক হ'য়ে যাবে না? প্রতিরোধটাই ধ্বসে পড়বে।

'মোহিতবাবু নামে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী। ক্যাম্পে থাকতো। পালিয়ে গেছে সে। ব'লো এই যদি গেলো, হিন্দুআনি, বাঙালীআনা কোনটির মূল্য থাকলো?'

বিমি ভাবলো—লতার কথা হয়তো ঠিক বুঝতে পারেনি মালতী। কিন্তু লতার মতো ঘটনা অন্য অনেক ঘটে থাকবে। সে রকম অন্য অনেক লতার কথা মনে করলে তোলা যায় বটে ও প্রশ্নটা। সত্যি কিছু কি অবশিষ্ট থাকে? বলবে তবু মানুষ থাকে? কিন্তু তার চাইতে অস্পষ্ট আর কি? কি কি করার স্বাধীনতা আছে মানুষের? কোন পথে চললে সে মানুষ হ'য়ে ওঠে, আর কোথায় পৌঁছালে সে ভ্রষ্ট?

'উঠছো কেন, মালতী। ব'সো, চা করি। উঠে গেলেই তো নানা রাজ্যের কথা ভাবতে সুরু করবে।'

'তা হয়। কিন্তু বউদি এখন একবার আমাকে যেতেই হবে।'

'না, না, ব'সো চা করি।'

'না, বউদি, কয়েকজন লোক আসবে।'

মালতী চ'লে গেলো।

আর এটাও তো একঘেঁয়েই এই মালতী আর সোদামুনির আসা। এত আগ্রহ কেন দেখালো সে? যাবেই যখন কেন ধ'রে রাখতে যাবে। অনুরোধের তো একটা সীমা আছে।

উঠে দাঁড়ালো বিমি। উনুনে আঁচ দিলো। ঘরগুলো ঝাঁট দিলো। গা ধোয়ার ভঙ্গিতে গামছাটা কাঁধে ফেলে কি ভেবে নিলো। খোপা বাঁধলো আলগা ক'রে। হাত-পা ধুলো। কাপড় পাল্টালো। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবলো।

ছি! আবার আর একদিকে বাড়াবাড়ি করতে যাচ্ছে। কি ভাববে

ভুবনবাবু? নাই বা ভাবলো। ভয় কেন? একা থাকা কি সত্যি ভয়ের ব্যাপার হ'তে পারে? একি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করা? আর এখন চুল পেকে উঠছে। কানের ছু'পাশেই ছু'তিনটে ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে আছে। হয়তো নীরব রোদনের মতো বলা যায়—অকালে। তা হ'লেও বয়সও অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত হ'তে পারে। এ বয়সে আর কোথায় যাবে সে?

সৌম্যর বয়সই বা কত হ'লো এখন, কিংবা ভুবনবাবুর। এ বাড়ির বয়সও প্রায় তিন বছর হ'য়ে গেলো। সেই বন্যা হয়েছিলো '৫৬-র মাঝামাঝি। কি মেঘ হয়েছিলো আকাশে! কি কালো মেঘ! কিন্তু বন্যা যখন সুরু হ'লো আকাশ তখন সাদা ধবধব করছে।

আকাশ সব জায়গাতে কখনও কখনও ধবধবে সাদা হয়। সেই সাদা আকাশে বন্যার জলের মতো পাটকিলে মেঘও ছুটোছুটি করে।

আর সাদা মেঘই নয় শুধু, এখানেও নীল কুয়াশা দেখা যায়। রোজ নয় সোয়েথয়েট বাগানের মতো। কিন্তু বন্যার বছরে শীতও যেন এদিকে বেশী পড়েছিলো অন্যান্য বারের চাইতে। আর ছু-একদিন বড়ো রাস্তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হ'তো রাস্তাটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেছে নীল নীল বন্যার ভাঙ্গনে। কুয়াশার কথা মনে হ'তে পারে। তার আগে মনে হ'তো রাস্তাটার ওই প্রান্তে গেলে হঠাৎ পা পিছলে যেতে পারে তারপর তলিয়ে যেতে হবে কতদূর কোথায় কে জানে।......

'একি সৌম্য! কখন এলে?' বললো বিমি।

'সকালে।'

'ভালো খবর সব? তারপর—কেমন সুন্দর কুয়াশা, না?'

'দরকারের কথা আছে।'

বিমি ভাবলো যদি টাকা চায় সৌম্য তা' অবশ্যই দিতে পারি। সৌম্যর থেকেই তো, তার উদ্যোগেই এই টাকা। এই চা বাগানে অন্য অনেকে তার চাইতে অনেক বেশী মাইনে পায়। কিন্তু সে যা পায় তাই তার কাছে যথেষ্ট। আর সৌম্যকে অদেয় কি আছে?

'হবে। স্নানাহারের ব্যবস্থা করি। বিকেলের আগে তো গাড়ি নেই।'

'করো।'

টেবিলের এপারে সে ওপারে সৌম্য। খেতে খেতেই কথা হ'লো।

'কিছু করার কথা ভাবছো? এর মানে অবশ্য এই নয়, তোমার জন্য

আমি খুব ভাবছি। এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছি এত স্বস্তি পাচ্ছি, তুমি কেন পাবে না?'

'কিছুই ভাবছি না। কিছু না করা মন্দ নয়। দোকানটাকে বিদায় ক'রে দিয়ে বেশ হাল্কা লাগছে।'

'মিট মিট ক'রে হাসছো তুমি। কিছু একটা নিশ্চয় করো।'

'করি, রাজনীতি।'

'সে কি?'

কুয়াশা নয়, নীল আলো। স্বপ্নে তোমার নিরাবরণ দেহের চারিদিকে যে আলো জড়িয়ে যেতে পারে। তোমার হৃৎপিণ্ডটায় যে আলো সঞ্চারিত হ'তে পারে। কি শক্তি, কি জ্যোতি।……

'আজও এত সকালেই?'

'তুমি বা কি ক'রে টের পেলে আমি আসবো। এখন তোমার তো ডিউটিতে থাকবারই কথা।'

'হসপিট্যালের জানলা থেকে মনে হ'লো তোমাকে দেখলাম। চা হয়েছে খাওয়া? ব'সো খাবার বানাই।'

'ডিউটি নেই?'

'ছুটি নিয়ে এসেছি, এ বেলার।'

'রোজই যদি আসি, রোজই ছুটি নেবে নাকি?'

'না। আজ তুমি আসবে তা কাল সন্ধ্যাতেই তুমি চ'লে যেতেই মনে হয়েছিলো। তুমি এত ভাবো! সত্যের এত কাছে তোমার ভাবনা এতে শুধু অবাকই হইনি। অবাক হ'লাম ভেবে কি ক'রে লুকিয়ে রাখো।'

'তা হলে তুমি রাজী আছো।'

'নিশ্চয়। আমার মনে হয়েছে সেটাই একটা করার মতো কিছু যা তুমি বলছো।'

'তা হ'লে বলি। কলঘরের বড়ুয়া সাহেব আমাদের লোক। গুদামের শ্রীমন্ত বাবুও। এদিকে তুমি। তিন মাসে পাল্টা ইউনিয়ন খাড়া করতে হবে।'

'হবে, হ'য়ে যাবে।'

'খুব সহজ কিন্তু নয়।'

কাজে যাবার পোশাক, বনেট খুলে এসে স্টোভ জ্বালালো বিমি।……

সেদিন বড়ুয়া আর শ্রীমন্তও এসেছিলো।

'বনেদী ইউনিয়ন এবার ভেঙে পড়বে। সে ইউনিয়নের শ্রমিকেরা যে এতদিন নিজেদের প্রাপ্য পায়নি তা বুঝবে।'

'কিন্তু শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ…'

'তা একটু হবে। বনেদী ইউনিয়ন তো কাউকে কাউকে এখনও মোহমুগ্ধ ক'রে রেখেছে।'

অনেক আলাপ, অনেক পরামর্শ। রাত দশটায় শ্রীমন্ত আর বড়ুয়া গেলো।'

'এখন?' বললো সৌম্য।

'রান্না করি।'

'তারপর?'

'এখানেই থাকবে।'

আহার শেষে শোবার ঘরে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আবার আলোচনা।

'রাত একটা হ'লো।'

'হুঁ। তোমার হাই উঠছে। পাশের ঘরে বিছানা ক'রে রেখেছি।'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' সৌম্য বললো।

'যাও ঘুমোও গে। মশারিটা হসপিট্যাল থেকে চেয়ে এনেছি। একটু নিচু। তা এক রাত কষ্ট ক'রে চ'লে যাবে।'

শুধু বাঁচা নয়। প্রাণ বিকিরণ করার মতো তারুণ্য ফিরে পাওয়া যেন মনের। যেন বলা যাবে, এত বেদনা এত কষ্ট, সার্থকতার এই পথে এসে দাঁড়িয়ে সবই তপস্যার মতো মূল্যবান হ'য়ে উঠবে। কত আশা মানুষের জন্য। কত আশা এই পৃথিবীর। এই পৃথিবী যেন আবার নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে। এতদিন শুধু কিছু সময় নষ্ট হয়েছে বৈ তো নয়। তাকেই বা ব্যর্থ বলা হবে কেন? অভিজ্ঞতারই বা কি কম মূল্য?

কিন্তু যত না আলো ততখানিই ছায়া। যতটুকু আকর্ষণ ততটুকুই নিস্পৃহতা। এক ধূসর দিগন্তের দিকে বিস্তৃত বালুরাশিতে ক্লান্ত পা দু'খানাকে টেনে টেনে চলা। ঢোক গিললো বিমি। এপারে হলুদমোহন ক্যাম্প। ওপারে উদ্বাস্তুদের পল্লী। ভুবনবাবু আসবে এখনই। আর সে তো বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

॥ ছয় ॥

আর দু-দিন। খবরটা এখন সকলেই জানে। কিসে যাবে?

ইভ্যাকুয়েশন কাকে বলে জানো? সেবার রেঙ্গুনে হয়েছিলো। যত রকম যানবাহন আছে সব। যে কোন জিনিস হ'লেই তা কাজে লাগবে, চাকা থাকলেই হ'লো। ঠেলা গাড়িতো গাড়িই বটে, হাসপাতালের চাকা লাগানো ভাঙা খাটও যেন গতির আধার হ'য়ে উঠবে। অথচ এই বেয়াড়া রকমের রসিকতায় হেসে উঠবার মতো মনের অবস্থা থাকে না, বরং যেন করণীয়ের ইঙ্গিত মনে ক'রে অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে। আর নানা আকারের চাকার সেই কর্কশ ভাষণ উৎক্রোশ চিৎকারের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে নানাদিক।

এখানে আর তেমন কি জলবে?

কিন্তু এসব চিন্তা করার চাইতে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকাই উচিত মানুষের। মহিলা-সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে যাওয়ার কথা অনেকদিন থেকেই। তা ছাড়া পুনর্বাসন অফিসে ঋণের কিস্তিটাও পৌঁছে দেয়া যায়। ভুবনবাবু একা মানুষ। ওদিকে টিউশানি ধরেছে। পার্টনার হ'তে হ'লে খানিকটা কাজ বিমিকেও করতে হবে বৈকি।

একটা নতুন ধরনের শব্দ। এপাশে ওপাশে তাকালো সে। বাঁয়ের দিকেই। নতুন বাড়ির ছেলেটি। চাকা চলছে। চাকার সঙ্গে সঙ্গে সাঁই সাঁই ক'রে দৌড়ে আসছে। ওদের বাড়িটা সামনেই। বোধ হয় বাড়ি পর্যন্তই ওর দৌড়ের সীমা এদিকের।

বাড়িটার দিকে চোখ পড়লো বিমির। দড়ি টাঙিয়ে ধোয়া কাপড় জামা মেলে দেয়া হয়েছে। অনেকটা রোদ পায় বাড়িটা। বেশ খানিকটা ঝকঝকে রোদ।

খুদে খুদে নাক দিয়ে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলছে ছেলেটি। হাঁপিয়ে উঠেছে। কিন্তু থামলো নাতো! বোধ হয় বিমিকে প্রতিযোগী কল্পনা ক'রে নিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, কিন্তু এত হাঁপিয়ে পড়েছে, তা পারছে না। কিংবা বোধ হয় চাকাটাকে নিজের কায়দায় রেখে যে কোন গতিতে চলতে পারার পরীক্ষা করছে। ছেলেটির পোশাক পরিচ্ছদে কি অযত্নের ভাব?

আজ হয়তো ওদের বাড়িতে কাপড় কাচার দিন। যা তা একটা পরিয়ে দিয়ে ভালোগুলো সব কেচে দিয়েছে। কিংবা এমনও হ'তে পারে এই দুরন্ত ছেলেটি দু'দণ্ডেই সব ময়লা ক'রে ফেলে আর মাকেও পরোয়া করে না। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়। পরিশ্রমে মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু ছেলেটি আবার পিছিয়ে পড়লো। চাকা ঘুরিয়ে আবার ছুটে চললো। ওদের বাড়িটা পার হ'লেই খোলা জমিটুকু। তা হ'লে এ জমিরও মালিক আছে? চাষ হয়েছে যেন? সবটা নয়। যেখানে জমিটা খুব নিচু সেখানে বোধ হয় এখনও জল আছে। কচুরিপানার জঙ্গলও।

এর পরেই গুদাম। টিনের দরজাটা আজ খোলা।. একটা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে মাল নিচ্ছে। এরকম সব গাড়িই দূরে দূরে নিয়ে যায় পণ্য।

আর কিছু এগিয়ে গুদামটার উল্টো দিকে বস্তি সুরু। এই বস্তির মধ্যেই পথের ধারে পশ্চিমা মুদির র‍্যাশানের দোকান। একটা ধানভানার কল বসিয়েছে যেন। কলটা ঝক ঝক ক'রে চলছে। দোকানটা বাড়ছে তা হ'লে।

এখন কোন পথে যাবে? সম্মুখে বেশ খানিকটা ভিড়। তাই স্বাভাবিক। এই পথটা ধরে যতই এগোবে অনেক পথ দু'দিক থেকে এসে মিশতে থাকবে। ক্রমশ ভিড়ও বাড়বে। একেবারে হালে হয়েছে এমন কাঁচা পথ যেমন আছে, তেমনি আছে একেবারে সেকেলে লাল ধুলোর পথ। আবার কালো পিচঢালা শাখাও আছে এই বড়ো কালো পিচের প্রবাহের। নানা রকমের প্রয়োজনে নানা পথ।

লাল ধুলোর পথগুলিতে চলতে গেলে একটা অভিনব অনুভূতি হয় যদি অনুভব করার মতো মনের অবস্থা থাকে। ধুলো, আর কোথাও কোথাও লাল ইটের টুকরো বেরিয়ে আছে। চলতে কষ্ট হয়। গাড়ি টালমাটাল করে। কিন্তু মনে হয় যেন পুরনো কোন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দিয়ে চলেছি। আর এসব পথ দু'চারশ' বছরের পুরনো না হ'ক, যারা তৈরি করেছিলো তাদের চিন্তা ভাবনা সেকেলে ছিলো। পথের ধারে ধারে গাছ। গুড়িগুলো পাকানো পাকানো। এখানে সেখানে অর্বুদ। বড়ো বড়ো খোঁদল। পথের ধুলোয় পাতাগুলো ধূসর। তবু ছায়া দেয়ার জন্যই গাছ। কালো পথের ধারে ধারে লোহার তারে বাঁধা লোহার খুঁটি শুধু। চোখে পড়া মাত্র ঝলসানির কথাই মনে আসে।

আজ যে ঋণের কিস্তি দেয়ার একটা তারিখ তা বোধ হয় ভুবনবাবু ভুলেই গেছে। ভুলে যাওয়া স্বাভাবিকও। আজ সকালে বারান্দায় রায়মশাই এবং অন্য কেউ কেউ ভুবনবাবুকে নিয়ে বেশ একটা আড্ডা জমিয়েছিলো। আলোচ্য বিষয় রাজনীতি। দু-একটা কথা ভিতরেও ভেসে আসছিলো। মনে হয় রাজনীতি যেন একটা নদী যা প্রবাহিত হচ্ছে। বাঁধ ভেঙে নতুন কোন পথে যাবে—তাই যেন জল্পনার শেষ নেই। তখনই মনে হয়েছিলো ভুবনবাবু হয়তো ভুলে যাবে। তা গেলই বা। গলা শুনে মনে হচ্ছে সে একটু স্বাভাবিক হ'য়েই কথা বলছে। আলাপ থেকে এটাও বোঝা যায় ভুবনবাবু ক্রমশ এ পাড়ার বিশিষ্ট একজন হ'য়ে উঠছে। বাইরে ভুবনবাবু। আর ভিতরে সে।

জীবনের উপমাই যেন। ভিতরে শূন্যতা বাইরে যতই কোলাহল থাক। একটা শূন্যতা, বুক চলতে চলতে হঠাৎ ধক ক'রে থেমে গিয়ে আবার চলার আগে যে শূন্যতা অনুভব হয়। এই উপমাটা তখনও মনে জাগেনি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তখনও পড়েছিলো, এখনও পড়লো।

কালো রাজপথ ছেড়ে দিয়ে এপথেই এসে পড়েছে সে তা হ'লে। এরকম একটা পথের ধারেই সেই বাগানবাড়িটার ধ্বংসাবশেষ ছিলো। সেখানে অন্তত সাতদিন ছিলো মরণচাঁদের দল। পরিত্যক্ত হাড়ি কুঁড় দেখে যেমন, ঘুনধরা চুনখসা দেয়ালের গায়ে কালির দাগ দেখেও তেমন বোঝা গিয়েছিলো তাদের আগেও এমন অনেক দল আশ্রয় নিয়েছে। সামনের এই জঙ্গলটার আড়ালেই বোধ হয় সেই বাগানবাড়ি। এটা বোধ হয় পিছন দিক। তা হলে সে তার পল্লী থেকে অনেকটা দূরেই এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। প্রায় সাতদিন লেগেছিলো এই বাগান থেকে ক্যাম্পে পৌঁছাতে। এক ক্রোশ কিন্তু সাত দিনের পথ। কত ঘটনাই ঘটতে পারে, ঘটেছিলোও সেই সাত দিনে। বিন্দা হারিয়ে গিয়েছিলো একদিন। শ্রীকান্ত অশ্রাব্য কুৎসিত ভাষায় মরণচাঁদকে তিরস্কার করতে সুরু করেছিলো। তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য মরণচাঁদকেই দায়ী করেছিলো সে। মারতে গিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত। দু'দিন পরে বিন্দা ফিরেছিলো। গায়ে জ্বর, চোখ লাল। ডাক্তার কোথায়? মাথায় দেয়ার জলও নেই। গ্রীষ্মই বোধ হয় তখন। স্নান নেই চারদিন। কিন্তু মরণচাঁদ ডেরা ভাঙেনি। কোথায় যাবো? শহরে এলা কেন? থাক বইসে। ক্যাম্পো? তা দেখো ঘুরে ফিরে কি সুখ সেখানে। তার বাদে

যাচাই করো। ঢুকলে কি আর বেরুবা। এক সন্ধ্যায় একজন লোক এলো। প্রথমে সে ঘুরে ঘুরে দেখলো। শেয়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করলো। প্রায় মাঝ রাতে সে এলো সোজসুজি প্রস্তাব নিয়ে। আভাস ইঙ্গিতে নয়, সুস্পষ্ট প্রস্তাব, টাকার অঙ্ক সমেত। শহর, শহরের কাছে এসে পড়েছি। সামাল, সামাল। পাকের টান লেগেছে। চোপরাও হারামজাদীরা, নড়বি না। মরণচাঁদ উঠে দাঁড়ালো। বুক ওঠা পড়া করে কেন তোমার? এইবার? ভয়? চোখে জল কেন, মৃত্যু? হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো মরণচাঁদ লোকটার উপরে।

বিমি হাঁটতে লাগলো।

এক মুহূর্তেই মরণচাঁদকে দুমড়ে মুচড়ে রেখে লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে চ'লে গিয়েছিলো। পরাজয়। দলপতির পরাজয়ের পরেই ক্যাম্প। মাথা নিচু ক'রে ক্যাম্পের দিকে চলেছিলো যেন দলটা। মরণচাঁদকে কেউ আর পথের কথা জিজ্ঞাসা করে নি। ন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে হারজিতের কোন সম্বন্ধ নেই। এই পৃথিবীতে, বিমি, এটাই বহুবার ঘটেছে, যাকে ন্যায় বলো তারই পরাজয়। পরাজয়ই হয় জীবনে। প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। জীবন ফাঁকা হ'য়ে যায়।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করলো বিমলা।—আর এবার মরণচাঁদের দলও থাকবে না। এই দণ্ডকারণ্যের পথে।

একটা বুড়ো গরু ধীরে ধীরে চলছে। হাড় জির জিরে। এত ধীরে ধীরে চলছে সেটা যেন চলার জাবর কাটছে। অনেক চলেছে সারা জীবন। এবার জাবর কাটতে থাকবে। একটা বড় ঘুমের আগে যেন তন্দ্রা এসেছে তার আলস্যের।

কোন কথাই যদি সত্যি হয় তা হ'লে সেটা এই যে সে কিছুতেই আজ চিন্তা করবে না।

পথের বাঁ দিকেই চোখ পড়লো। পথটা পরিচিতই বোধ হচ্ছে। এ গাছটাও হয়তো তা হবে। গাঁট গাঁট বাঁকা তেড়া, মরা গুঁড়ির গা থেকে সরু সরু কয়েকটা ডাল বেরিয়েছে। শুকনো কাঠ, কাঠ। কাঁটাও দেখছি সারা গায়ে। গুটি কয়েক পাতা আছে গাছে, তাও সরু ডালগুলির ডগার কাছে। আশ্চর্য, ফুল! লাল থোকা থোকা ফুল। চার পাঁচটি থোকা তো বটেই। সরু ডালগুলো যেন ফুল কটিকে তুলে ধ'রে আছে। যেন এ গাছের ধার ক'রে আনা। কাঠি কাঠি ডালগুলোর মাথায় পরিয়ে দেয়া।

বর্ষায় এরকম হয়। অনেক উদ্ভিদ সাড়া দেয়। কিন্তু এখন বর্ষা কোথায়? ফাল্গুন যায় যায়। জরাজীর্ণ ব্যর্থ আর একটি বৎসর প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এক ফোঁটা বৃষ্টিও নেই। গাছটার গোড়া থেকে মাঝামাঝি অবধি সুরকির রং লাগানো। ধুলোয় হয়েছে। কিন্তু এ ফুল প্রসবের প্রাণ কোথায় পেলো? এই নতুন হ'য়ে ওঠা?

কি করবে সে?

নারী-শিল্প-সমিতির অফিসে যাওয়া যায়। বেলা পাঁচটা অবধি কাটিয়ে দেয়া যায় সেখানে। ফরম নিতেই এসেছি, তাই ভাববে। তাছাড়া নারীদেরও সমস্যা আছে, তুলে ধরলেই হ'লো।

মাদার বোধ হয় গাছটা। ওর অত্যন্ত ভালো একটা নাম আছে, মন্দার।

সোদামুনি আর অবিমন্যুর মতোই। তা হ'লে বলতে হয় মন্দারের মতোই তারা চ্যুত, স্খলিত।

কিন্তু কি সুন্দর যে লাগলো আজ ফুল ক'টিকে!

আর সোদামুনি বলেছিলো, অমন শক্ত আঁশ আঁশ যার চামড়া অমন নরম ফুলে তার বুকে জন্মায় না। এই মন্দারের কাছে ডেকে এনে দেখাতে হয় সোদামুনিকে। বসন্ত এসেছে তা কি বুঝতে পারছো? কিন্তু ফুল ফোটানোর সব কটা ঋতুকে পার হ'য়ে হ'য়ে এসে এই ক্ষণস্থায়ী চপলতার কাছে আজ ক্ষণেকের জন্য ধরা দিলো এই মাদার। কোকিলের ডাক নেই, শিহরিত হ'য়ে ওঠার মত পল্লব নেই, তবু যে ফুল ফুটলো, কি রক্তিম তারুণ্য তার!

সোদামুনির মাসির কথা তুলে লাভ নেই। তার মাসির কথা সেই সব চাইতে ভালো জানবে। তবে তার যুক্তিটাকে এই মাদারের তুলনায় আর জোরদার ব'লে মনে হয় না। অন্য কারো কারো জীবনেও এরকম কিছু ঘটতে পারে!

বিমি ঠিক যেন এখানে পৌঁছুতে চায় নি। যেন এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজবে।

'এদিকে আসুন, এদিকে দরজা। চিনতে পারছিলেন না তো? আমরা আপনার চলা দেখেই আন্দাজ করেছিলাম।' নারী-শিল্প-সমিতির সভ্যারা বললো।

'তারপর কি মনে ক'রে?'

'এলাম।' বললো বিমি।

'ভালোই করেছেন। দেখুন মেয়েরা কেমন সুন্দর হাতের কাজ করেছে। বাটিকের কাজের কতগুলো নকশা একেবারে নিজস্ব আমাদের। আর শুধু সখের জিনিসই নয়। বেতের চেয়ার টেবিলও বিক্রি হচ্ছে বাজারে। এক কথায় পুনর্বাসন।'

বিমি চোখ তুললো। মালতীরই যেন বয়োবৃদ্ধ সংস্করণ। অনেক দিনের দেখা লোক। তুলনাটা আজ মনে প'ড়ে গেলো। শুধু এর কপালে দগ দগ করছে সিঁদুর। কালো মোটা চশমার নিচে গাল দুটিতে অনেক ভাঁজ।

'তারপর, আপনাদের পাড়াতেই তো হলুদমোহন ক্যাম্প। কবে যাচ্ছে ওরা? কালই?' সমিতিপ্রধানা খুশি মুখে প্রশ্ন করলেন।

'যাবে।' বললো বিমি।

'তা ভালোই হবে। মানুষের অসাধ্য কি? আর নতুন মাটি তো। কি জন্যে এসেছেন, বলুন এবার।'

'দেখা শোনা। আর কতগুলি ফরমের দরকার আছে।'

'ফরম? শোভা, সব রকমের ফরম কিছু কিছু আনো তো। দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আপনার মত কি?'

'আমার? আমার মতের কি দাম? ভালোই হবে হয় তো।'

'ওটা কি আর কাজের কথা হ'লো। আলোচনায় আসছেন না যেন।'

'আমাদের বয়সে—'

শিল্প-সমিতির কর্ত্রী খপ করে চেপে ধরলো বিমিকেই যেন। 'বয়স? কি বয়স আপনার? বত্রিশ তেত্রিশ? আমার ছেচল্লিশ হ'লো। বুঝতে পারেন? মানুষ যদি উন্নতির চেষ্টা না করে—'

বিমি যখন বেরিয়ে এলো সমিতির দপ্তর থেকে তখন প্রায় তিনটে হয়েছে বেলা, দপ্তরের ঘড়িতে। হাঁটতে লাগলো বিমি। কিছু দূরে গিয়ে সমিতির দপ্তর থেকে আনা ফরমগুলো তার হাত থেকে প'ড়ে গেলো। প'ড়ে যেতে দিলো সে? কিম্বা তার মন তখন অন্যদিকে স'রে গিয়েছে।

মানুষ কি নতুন কিছু করতে পারে? দণ্ডকারণ্য। বিশ্বাস করার চেষ্টা করলো বিমি মানুষ সেখানে নতুন হ'য়ে উঠবে। বিশ্বাসটাকে স্থির হ'তে দিলো না যেন কেউ। মানুষ না হয় ফুল ফুটিয়ে তুললো। কিন্তু মানুষ কি মাদার গাছ? গত বছরের ফুলকে মাদার ভুলতে পারে। পারো তুমি?

একটা অদ্ভুত কিছু ক'রে বসলো বিমি। আচমকা ঘটলো। মনের অনেক গভীর তল থেকে কিম্বা অনেক দূরের স্মৃতি থেকে কথা উঠতেই সে যেন অন্য সব কিছু বিস্মৃত হ'য়ে এই জেগে ওঠার ব্যাপারটাতেই কৌতুক বোধ করলো। একলিজিয়াস্ট? তাই হবে। দেয়ার্স নাথিং নিউ আণ্ডার দা সান্। কোথায় নতুন পাবে? মানুষ কি ভুলতে পারে?

নতুন? মানুষের ইতিহাসে কি নতুন হ'য়ে ওঠার কোন নজিরই আছে?

বিমির মনে হ'লো কোথায় যেন মানুষের পুনরুত্থানের কথা আছে। কে উঠেছে? সার্থকভাবে ভালবাসা, অন্বেষ? তাই বোধ হয়, সেটাই একমাত্র নজির। ওরা জানে না কি করছে ওরা! ক্ষমা করো।

দীর্ঘশ্বাস পড়লো বিমির।

আর হাঁটবে না সে। অকারণেই যেন সে নিজেকে কষ্ট দিলো। দুপুরের রোদে রোদে ঘুরে বেড়ানোই সার হ'লো। পিপাসা পেয়েছে। সেটা এমন কিছু নয়। কিছুক্ষণ পরে আর মনে থাকে না। কিন্তু কি লাভ এই অকারণে ঘুরে বেড়িয়ে? সামনের সোজা পথটা ধ'রে গেলে পুনর্বাসন দপ্তর। কাছেই একটা বটগাছ আছে গোড়ায় বাঁধানো চাতাল। সেখানে বসা যায়। বসলে উদ্বাস্তু মনে করবে লোকে। প্রশ্ন করবে না। উদ্বাস্তুরাই বসে।

অত গাড়ি কেন ওখানে? বিমি বিস্মিত হ'লো। পুনর্বাসন দপ্তরই তো?

চার পাঁচখানা বড় বড় বাস। কয়েকখানা ট্রাকও। কোনটি ধুচ্ছে, কোনটি মেরামত করছে। হুসহুস ক'রে হোসের জল ছিটিয়ে। ঠুং ঠাং ক'রে পিটেপুটে। যন্ত্র পরীক্ষাও চলেছে। আয়োজন উদ্যোগের মতো ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে কাজ করছে। মেরামত কারখানাই নাকি হয়েছে ওটা। অনেক ছুটোছুটি ক'রে এসেছে বাসগুলো। তাই মেজে ঘ'ষে ধুয়ে পুঁছে যত্ন আত্তি ক'রে ওদের যেন তোয়াজ করা হ'চ্ছে।

উদ্বাস্তুদের জায়গাতেই বসেছে বিমি। তেমনি ক'রেই শহরের দৃশ্যগুলো সে দেখতে লাগলো যেন উদাস কৌতূহল নিয়ে।

হঠাৎ মনে এলো কথাটা। তাই নাকি? তাই নাকি? এ গাড়িগুলোতে ক'রেই কি ওদের সরানো হবে। একটা প্রস্তুতি যেন। যুদ্ধ কথাটা এলো তার মনে। এক যুদ্ধের ক্লান্ত সৈনিক যেন এই গাড়িগুলি। সম্মুখে আর এক যুদ্ধের জন্য এরা প্রস্তুত হচ্ছে। যুদ্ধ, যুদ্ধ। ওরা কি হৈ-চৈ করবে, বাধা দেবে! মালতীর দল!

অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো বিমি।

এই ভয়ঙ্কর লম্বা লম্বা বাসগুলো যেন তাকে—কথাটা ঠিক ঠাহর হচ্ছেনা অনুভব করা যাচ্ছে; কথাটা কি টান, প্রভাব?—টানছে? যেন তারা প্রাগৈতিহাসিক শ্বাপদ, আর তাদের প্রবাদোক্ত আকর্ষণী শক্তিও আছে। ওরা কি পোষ মেনেছে, কখনও পোষ মানবে?

একটা মোটর গেলো হঠাৎ বিমির সামনে দিয়ে। এক মুহূর্তের জন্য বাস ও ট্রাকগুলো আড়ালে প'ড়ে গেলো।

এবার বিমি ভাবলো: ওগুলিকে আনাই স্বাভাবিক। এদিকে ছোট্ট ট্রেন। হয়তো দক্ষিণের বড়ো স্টেশনে গিয়ে ওরা দলে দলে ট্রেনে চাপবে। এ ব্যবস্থাই ভালো। ওঠ নামার ধকল এড়াতে পারবে।

চলতে সুরু করলো বিমি। বেলা প'ড়ে গেছে। এই দেখ, টাকাটা আজও জমা দেয়া হ'লো না। অফিস নিশ্চই বন্ধ হয়ে গেছে। বিমি যেন একটা আবিষ্কারের সামনে থমকে দাঁড়ালো। এই দ্বিতীয়বার হ'লো একরকম ভুল। শিল্প সমিতির দপ্তরে একবার আর এখানে এসে আবার। এজন্যই যে শহরে আসা তা কিছুতেই মনে পড়লো না।

ভাববো না স্থির করেছিলো, কিন্তু ভাবতে গিয়েই গোলমাল হ'লো।

কিন্তু তাতো নয়। মনের একটা অংশকে চেপে রাখতে গিয়েই এরকম হ'লো বোধ হয়। একটাকে পিছিয়ে রাখতে গিয়ে অন্য অংশগুলোও যেন পিছিয়ে রইলো। অস্পষ্টভাবে এই অনুভব করলো বিমি।

একটা সাইকেলের ঘন্টি বাজলো। খস ক'রে ব্রেক কষলো। থামলো একেবারে বিমির গায়ের কাছে। চমকে উঠলো সে।

'চমকে দিয়েছি তো।' ব'লে সাইকেল থেকে নামলো অজয়। 'এখানে কোথায়? কাজ ছিলো?'

'কাজ—'

'আমারও কাজ ছিলো। পুনর্বাসন দপ্তরে গিয়েছিলাম। গাড়ি এসে গেছে, মানে ক্যাম্প থেকে লোক নিয়ে যাবার। বাড়িতে ফিরছেন তো? চলুন একসঙ্গে যাই। আর কোনদিনই হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। একটা লাইব্রেরী আছে। ঘুরে যাবো। নতুন লাইব্রেরী। মোহিতের জন্য বই নিয়ে যেতে হ'তো এখান থেকে।'

'অসুখ কি রকম?'

'আর অসুখ। পুনর্বাসন দপ্তরে ব'সে ব'সে মনে হ'লো ওর কথা। হেঁয়ালির মতো লাগলো মোহিতকে। ওই সামনের বাড়িটাই লাইব্রেরী।'

অদূরে একটা ছোট বাড়ি। ঝকঝকে নতুন। যত না দেয়াল তার চাইতে বেশী কাচের জানালা। রাস্তায় আলো জ্ব'লে ওঠার আগেই ভিতরে আলো জ্ব'লে উঠেছে। কাচের জানালা দিয়ে সে আলো যারপরনাই সুন্দর দেখাচ্ছে।

'এরকমই হওয়া উচিত,' বললো অজয়, 'আলোর কথা বলছি। ওখানে ব'সে পড়ে অনেকেই। একটা ঘর আছে, জানেন, পড়তে পড়তে চোখ তুলে তাকিয়ে আকাশের মেঘ চলাচল দেখা যায় কাঁচের পর্দা দিয়ে।'

'এখানে দাঁড়াই আমি।' বললো বিমি। ভাবলো: পুনর্বাসন দপ্তরের সামনে থেকে উঠে তা হ'লে সে বাড়ির পথ ধরে নি? দেখো কাণ্ড!

'ভিতরে আসবেন না?'

অজয় লাইব্রেরীর ভিতরে চ'লে গেলো স্ট্যাণ্ডে সাইকেল রেখে।

বিমলা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে শার্সি দিয়ে পড়বার ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। বোধ হয় এটা ছোটদের পড়বার ঘর। তাদের উপযুক্ত বইপুঁথি দিয়ে সাজানো। সাত আট থেকে দশ বারো বছরের কয়েকটি ছেলে। পরিষ্কার সাজানো ছবি যেন। কি খুশি দেখাচ্ছে ছেলে কটিকে। যেন বাইরের শীতের থেকে ওরা এক কবোষ্ণ মাধুর্যে আশ্রয় নিয়েছে। একটা ছোট ছেলে, বোধ হয় বড়ো কারো সঙ্গে এসেছে, বই পড়তে সে পারে কি পারে না— কাচের পর্দার কাছে দাঁড়িয়ে সে কি দেখছে বাইরের দিকে, বিমিকেই দেখছে নাকি?

অজয় লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো বিমি কাচের পর্দার কাছে গিয়ে যেন অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওটা কিন্তু দরজা নয়, জানলা।'

বিমি অজয়ের এই কণ্ঠস্বর শুনে যেন একটু লজ্জিত হ'লো, তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে এলো। অজয় বললো, 'আমাদের কিন্তু এসবের সুযোগ ছিলো না। আমাদের লাইব্রেরী বলতে বোঝাতো স্কুলের সব চাইতে ছোট ঘরখানার পুরনো বইএর গন্ধভরা কয়েকটি আলমারি।'

বিমি ভাবলো: সকাল বেলার কথা নয়। তবু সেই ছেলেটার কথা। মনে মনে তার চারিদিকে আলোকিত কাচের সন্ধ্যা নামিয়ে আনলো সে। ঢাকা ছেড়ে সেও হয়তো এই লাইব্রেরীতেই আসবে।

আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো তার।

অজয় বললো, 'কিন্তু একটা কাজ যে ভুলে এসেছি। বাজারে যাব ভেবেছিলাম। সুরথবাবুর জন্ত একটা মশারি কেনা দরকার।'

'যান বাজারে তবে।' বললো বিমি। ভাবলো—এটাও নতুন। ছেলেদের এই পড়ার উপরে ঝোঁক।

অজয় বললো, 'আপনি? আচ্ছা এক কাজ করি। চলুন ব্রাহ্ম-পাড়া দিয়ে যাই। ওখান থেকে আমি বাজারে যাব। আপনি মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবেন।'

'চলুন।' বললো বিমি। ভাবলো—সত্যি কোন নতুনের স্বপ্ন যেন।

'আপনাকে বলছিলাম আমাদের সময়ে এসব ছিলো না। তবু ভালো, এখন হয়েছে। সব চাইতে এটাই ভালো লাগে, আমাদের এই পুরনো জাতটা নতুন হয়ে উঠছে। অবশ্য—' অজয় হাসলো। কিসের যেন সঙ্কোচও বোধ করলো সে।

বিমি ভাবলো: আজ যেন অনেকেই নতুন হ'য়ে ওঠার কথা বলছে। অবশ্য…কিন্তু…দুঃখের কথাই যেন। একটা অমিলই বোধ হয় ভিতরে বাইরে।

একটু থেমে অজয় বললো, 'এ রকম সহজ নয় ব্যাপার। চট ক'রে আশা-বাদী হয় দু'রকমে। রাজনীতির গোঁড়া ভক্ত, আর যার ভাবনা চিন্তার বালাই নেই। একটা ইংরেজী কবিতা আছে জানেন, পৃথিবীটা এক বুড়ী, শুকনো বন্ধ্যা প্রান্তরে লকড়ি খুঁজে পাক খাচ্ছে।'

বিমি ভাবলো: কিছুক্ষণ আগে…আর এই অমিলটা…হ্যাঁ দুঃখই তো। সোদামুনির মাসির কথাই ভাবো। শুকনো আঁশের মতো তার ত্বক। কিম্বা ওই মাদার।

অজয় বললো, 'কিন্তু সৌম্য এ কবিতাটাকে দুয়ো দিতো। ঠাট্টা করতো। বেশ লাগতো সৌম্যকে আমার। আপনার কেমন লাগতো? ভালোই, না? না চাকরি ক'রে দেয়ার কথা বলছি না। সে ও অনেকের জন্তই করতে পারতো। আমাদের সঙ্গে, মানে, আপনি, আমি, মোহিত আমাদের সঙ্গে ওর একটা অন্ত সম্বন্ধই গ'ড়ে উঠেছিলো।'

বিমি ভাবলো: এখনই যা হ'লো তা থেকে বলা যায় তার বুকেরই কিছু দোষ হয়েছে। ধক্ ক'রে থেমে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে চলতে সুরু

করলো। উদ্বাস্তু জীবনের এটাই বোধ হয় স্থায়ী চিহ্ন থেকে গেলো, বুকের এই রোগ। অথচ বাইরে থেকে এখন তাকে স্বাস্থ্যবতীই মনে হবে।

বললো সে, 'যাবেন? এখান থেকেই আপনি বাজারে যেতে পারেন।'

'তাও পারি। ব্রাহ্ম-পাড়াই তো ডান দিকে, নয়? দু'জনে এক সঙ্গে যেতে পারলে আর একটু গল্প করা যেতো। আচ্ছা, পথের উপরেই বিদায় নিচ্ছি।'

অজয় চ'লে গেলো।

সন্ধ্যা হয়েছে। ডানদিকে ব্রাহ্ম-পাড়া। এ পাড়াটা শহরের নতুন পাড়ার মাঝখানে হ'লেও প্রাচীন চারিদিকের তুলনায়। একটা ছোট বাগানের মধ্যে একটা সাদা বাড়ি। মিট-মিটে একটা আলোও জ্বলছে ভিতরে। মন্দিরটাই বোধ হয়।

কোন কোন সন্ধ্যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আজকেরটি যেন হাল্কা খয়েরী রঙের। সব কিছু যেন সেই রঙে রাঙানো।

শুকনো পাতা পায়ের তলায় মড়মড় করলো। কে আর ঝাঁট দেয়। আগে বোধ হয় মালী ছিলো। আর বাগানও নেই এখন। একদিকে এক গোছা বুড়ো পাম গাছ। আর দরজার পাশে এই নাগকেশর দুটি। নাগকেশরের শুকনো পাতাই পায়ের তলায় ভাঙছে। এটা যদি বসন্তকাল হ'য়ে থাকে, এখন নাগকেশরে কচি পাতা হওয়ার সময়ও। বিমি মুখে তুলে চাইলো কিন্তু দেখতে পেলো না।

নতুনের কথা বলতে গেলে এই মন্দির সম্বন্ধেও তা যায়। ভুবনবাবুর সঙ্গে আলোচনায় এবং তারও আগে বাবার মুখে সে শুনেছে একটা জাতি নতুন হ'য়ে উঠেছিলো।

মন্দিরে প্রার্থনা হচ্ছে। আচার্য প্রার্থনা করছে। মৃদু আলোকে সামনের দিকে পাঁচ ছ-জন উপাসক। হল বোঝাই সারি সারি ধূলি-মলিন উঁচু ফাঁকা বেঞ্চ। এক সময়ে নিশ্চয়ই লোক হ'তো। বিমলার এ রকম একটা ঝোঁক হ'লো কল্পনা করতে—উপাসকদের বেশির ভাগই আচার্যের আত্মীয়। আর আচার্যও হয় তো কিছু মাসোহারা পায় প্রার্থনার সর্তে।

দেয়ালের গায়ে বিবর্ণ শালুতে লেখা ব্রহ্মের কৃপার কথা, হরেনর্মৈব কেবলম্।

নতুনের জোয়ারটা চ'লে গেছে, বালিতে তার দাগ।

পিছনের দিকে একটা বেঞ্চে বসলো বিমি।

হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, ক্ষমা করো। আচার্যের সুরে সুর মিলিয়ে ফিসফিস ক'রে বললো বিমি।

আচার্যের মন বোধ হয় আজ কোন কারণে বিষণ্ণ। কিংবা এই মন্দিরের আবহাওয়াই এটা।

ক্ষমা করো।

হঠাৎ বুকটা তোলপাড় ক'রে উঠলো যেন বিমির। কোলের উপরে রাখা হাত দুটিকে সে সংযুক্ত করলো। প্রার্থনাই সে করবে। হে ঈশ্বর, ক্ষমা করো।

সব সময়ে কি বেঁধে রাখা যায়। কখনও কখনও চিড় খেয়ে যায় না বুকের বাঁধ? হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো বিমি। গোপন রাখা যায় না।······

'তোমার কথাগুলি এমন নতুন লাগে, সৌম্য।'

'লাগে সেটা তোমার খুশি হওয়া দেখে মনে হয়। কিন্তু আমার জানা শোনা কত দূর তা বুঝি জানো না? সব সময়েই মনে হয় কত নতুনই জানতে পারতাম স্থির হ'য়ে ব'সে পড়তে পারলে।'

'আচ্ছা, সৌম্য, কতই বা তোমার বয়েস। তোমার হিসাব মতোই কুড়ি একুশের বেশী হয় না। পড়ো না তুমি। স্কুলে কলেজে নয়, এখানেই। বই আনিয়ে নাও।'

'বই?'

'হ্যাঁ। যখন যে বই দরকার।'

'সে তখন দেখা যাবে।'

'আচ্ছা, সৌম্য, পৃথিবী কি নতুন হ'য়ে উঠবে রাজনীতির পথেই?'

'বুঝতে পারি না বললাম যে। মনে হয় রাজনীতি একটা ধাপ। মানুষ নতুন হ'লে কি রাজনীতির আর দরকার হবে? রাজনীতি যেন একটা অস্থিরতার অপটু প্রকাশ। এটা কি খাচ্ছি বলো তো?'

'এক ধরনের পুডিং। দেখো সব ভুলিনি এখনও।' বললো বিমি। 'আচ্ছা সৌম্য, এখানে এসে আমার স্বাস্থ্যটাও ভালো হয়েছে, না?'

'অনেক হয়েছে।'

সন্ধ্যা হয়েছিলো। সৌম্য চ'লে গেলো। নীল একটা জ্যোতি যেন সেই সন্ধ্যা। বুকে যেন বিঁধে যায়। যেন বুকের ভিতরেও চলে যেতে পারে। এক মুহূর্ত জ্বালার পরই শান্তি।

কি যে হ'লো আজ। কি হ'লো লাভ সারাটা দুপুর হেঁটে হেঁটে, নিজেকে ক্লান্ত ক'রে? ক্লান্ত না হ'লে বোধ হয় আর একটু জোর থাকতো মনে। বরং সারাটা দিনই যেন আয়োজন ক'রে তাকে মুহ্যমান ক'রে দিয়েছে।

বেলা চারটে।......

অদৃষ্ট নিস্পৃহতাও নয়, অপ্রেমও নয়। অনুশোচনা, বরং যেন করুণার মতো অশ্রু ছলছল।

ঢোক গিললো বিমি। আর প্রায় উচ্চারিত হ'লো তার মনের কাছে ফিসফিস ক'রে বলা—কি লাভ? কি লাভ হ'লো?

বেলা চারটে। আগ্রহটা যেন আজ কান্না পাবে। পায়ের আঙুলের উপরে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে দেখতে লাগলো সে পথ। তার আগে সে আয়নার সামনে ব'সে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে খুশি খুশি মুখে কি ভাবলো। কি করবে, কি করবে? গান? দু' হাতের আঙুলগুলি। দু হাতের আঙুলগুলি পরস্পরকে জড়াচ্ছে। হাতে হাতে তালি দিলো সে মৃদুমৃদু। আয়নায় কি দেখবে একবার নিজেকে? পরনের শাড়িটা দু'দণ্ড আগে পরা। সেটা পালটে সাদা ধবধবে একখানা জড়িয়ে জড়িয়ে পরলো। ভিজে গামছা দিয়ে মুখটা আবার মুছে নিলো। পাউডার যেটুকু লেগেছিলো উঠে গেলো এবার। চারটে। জানলাটা উঁচু নয়, পথটাই অসমতল। আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে পথের সবটুকু দেখবার চেষ্টা করলো সে।

'এ কি?'

'পরো।'

'তাঁতের ধুতি আর গরদের জামা?'

'পরো, সৌম্য।'

'জামার মাপ পেলে কোথায়? এ কি ধুতির পাড় কুঁচিয়েছো ব'সে ব'সে?'

ধুতি পাল্টালো সৌম্য, পাঞ্জাবি গায়ে দিলো। পুরনো পাঞ্জাবিটা রিফু করার জন্ত রেখে দিয়ে ভালোই করেছিলো বিমি, নতুবা মাপ পেতো কোথায়?

'শহরে গিয়েছিলাম।' বিমি বললো। হাসি তার মুখে। 'তোমাদের শহরে নয়। চা বাগানের ওপারে মহকুমা শহরে। এ চা-বাগান তোমাদের শহরের সঙ্গে এক জেলায় নয়, তা জানো?'

'তাই নাকি?'

'চলো আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। বেশ বাড়িটা, না? মেরামতের কথায় ওরা ব'লছিলো পুরনো বাংলো রেখে কি হবে? বাবুদের পাড়াতেই একটা আধুনিক ধরনের ছোটখাটো বাড়ি দিতে চায়। আমি বলেছি মেরামতের কি দরকার হ'লো? যেমন আছে থাক না। এদিকে এবং ওদিকে দেখো। অন্য কোন বাড়ি দৃষ্টি আটকায় না।'

কোঁচানো ধুতিটার পাড় পায়ের পাতা পর্যন্ত পড়েছে। পাঞ্জাবিটার বোতাম দেয়া হয়নি। পাঞ্জাবি পরতে গিয়ে কয়েক গোছা চুল আলুথালু হ'য়ে কপালে এসে পড়েছে।

'আহ্। সৌম্য, সৌম্য।' বললো বিমি।

'ভাবছি।'

'কি ভাবছো? কিছুতেই ভাববার কি আছে? আমি অনেক ঘুরেছি সৌম্য। এ আমার দুঃখের অর্জন। বিশ্রামের বিন্দু পেয়েছি খুজে খুজে। চার্চে যাবে? অবশ্য এখনও প্রার্থনা হচ্ছে না। হওয়ার সময় হ'লোও বোধ হয়। ওটা মানুষের উধ্বর্মুখী গতির চিহ্ন। কাছে গেলেও মন খুশি হ'য়ে ওঠে। চলো বেড়িয়ে আসি।'

'ভাবছি, তুমি আমাকে দয়া করো কেন?' সৌম্য বললো।

'দয়া।' খিলখিল ক'রে মিষ্টি মিষ্টি ক'রে হাসলো বিমি। 'অল্প বয়স বলেছিলাম কবে, তাই? এত বড় হয়েছো তুমি। দেখো তো তোমার আঙ্গুলগুলো। পরিপুষ্ট, পরিপূর্ণ।'

লাল হ'য়ে উঠলো বিমি।

ঢং ঢং ক'রে চার্চে ঘণ্টা বাজলো। ভেস্পার? সন্ধ্যার প্রার্থনা উঠবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। জানো, এটা মেথডিস্ট গির্জা।

'কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!' বললো সৌম্য।......

'ঘুমোওনি তুমি?'

'না।'

'রাত দুটো পার হ'লো। কাল তো অফিস আছে।' বললো সৌম্য।

'থাকলোই বা। বেলাতেই উঠবো ঘুম থেকে। ঝি এসেই না হয় ডেকে তুলবে।'

'জেগে জেগে কি করছো?'

'তোমাকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম।'

'কি ?'

'তোমার কি-কি দরকার জেনে নিতে ইচ্ছা হয়। বইতো বটেই। কাল দুপুরে আসবে ? কি-কি দরকার সব জেনে নেবো। আমি মাইনে কত পাই তা তুমি জানো। কিন্তু কত জমিয়ে ফেলেছি শুনলে অবাক হবে।'

'দুপুরে ?'

'হ্যাঁ। কেন নয় ? দুপুরে তো এর আগে আসতে। তবে ? সৌম্য—

'উঁ ?'

'সৌম্য, আমার উপরে খবরদারি করার কেউ নেই পৃথিবীতে। আমিই আমার।' ঝিকমিক ক'রে হাসলো বিমি। 'আমি আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি, পারি না ?' স্বাধীনতার নেশায় জড়িয়ে জড়িয়ে এলো বিমির গলা। 'আর এতটুকু অতৃপ্তি কোথাও নেই পৃথিবীতে। ভগবান দেখো হাসছে বুকের মধ্যে।'

দয়া করো, দয়া করো, ভগবান।

নিঃশব্দ ফোঁপানিতে বুকটা ওঠানামা করছে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো বিমি আনত মুখে প্রার্থনার ভঙ্গিতেই। আর সে হাতের আড়ালে চোখ ভিজে উঠলো তার।

দয়া করো।

অথচ আজ সে মনকে বাঁধ দিয়ে বেঁধেছে ভেবে গৌরব করেছিলো।

কি হ'লো নিজেকে ক্লান্ত ক'রে ? সারাদিন উদ্বাস্তু হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়ে কি শান্তির বিশ্রামবিন্দুটি খুঁজে পেলে ? বেঁধে রেখে কি হবে মনের তলায়। বরং উঠতে দাও, ভাষা পাক। বোবার যন্ত্রণাই তো আরও বেশি। ভাষা দিয়ে ধ'রে দেখো, হয়তো মনে হবে নতুন নয়, অভিনব নয় এ বেদনা। ভাবো, প্রেম নয়, অপ্রেম নয়। ঘটনা। ঘটনা যদি না বলো, বলো বিস্ময়। মৃত্যু পর্যন্ত চ'লে চ'লেও যে বিস্ময় যায় না।

কিন্তু অশ্রুধারা নামলো। অশ্রু-অন্ধ হ'য়ে, অশ্রু আবিল মুখে সে বেরিয়ে এলো মন্দির থেকে। মনে হ'লো তার, এর পরে প্রার্থনামন্দিরের শুচিতা নষ্ট হবে।

কিন্তু তার আগে বোধ হয় ধর্মঘট হয়েছিলো। কোথা থেকে কি হ'য়ে গেলো। কিংবা বলো, বিমলা, তোমরাই তো প্রস্তুত হচ্ছিলে এ অশান্তির জন্তই। একেই তো তোমরা প্রাণশক্তির বিকাশ মনে করেছিলে, নিজেদের অস্থির সম্মুখ বেগের একটি প্রকাশ ব'লেই অনুভব করতে।.........

'সৌম্য, সৌম্য, কেন এলে তুমি?'

'কি বলছো?'

'তুমি যাও, যাও। পুলিস এসে ছেয়ে ফেলেছে চা বাগান। শ্রমিকরা মারামারি করছে। তুমি যাও।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, যাও। দোহাই তোমার, সৌম্য, যাও।'.........

আঁচল তুলে মুখটা মুছে নিলো বিমি। এখন অন্ধকার হ'য়ে গেছে। কেউ তাকে দেখতে পাবে না, আঁচল তুলে চোখ মুছলেও। তার ঠোঁট কাঁপলো যেন ক্ষমা কথাটাকেই সে আবার উচ্চারণ করবে।

অজয়ের সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে গেলো বিমির।

'অজয়বাবু?'

'হ্যাঁ। দেরি হ'য়ে গেলো। চলুন আবার এক সঙ্গে যাই।

'আপনি উদ্বাস্তুদের ভালবাসতেন, অজয়বাবু?'

'তা বলতে পারি না। তবে সৌম্য, মোহিত, লতা, এদের কথা স্বতন্ত্র।'

'আমি যখন আবার ক্যাম্পে ফিরলাম আমাকে একটি প্রশ্নও করেননি।'

'খবরের কাগজে সৌম্যের জেলে যাবার সংবাদ ছিলো। আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম ধর্মঘটের ফলেই আপনারও চাকরি গিয়ে থাকবে।'

নীরবে চলতে লাগলো দু'জনে।

বিমি ভাবলো এই ঔদাস্যই ভালো। এই বর্ষণক্লান্ত আকাশের মতো শূন্য অন্তর।

'আপনি কোথায় যাবেন অজয়বাবু?' বিমি প্রশ্ন করলো।

'কোথায়? যেখানে যায়। সব স্রোত যেখানে টেনে নেয় মরা মাছকে। কলকাতাতেই যাবো।'

'সে কি!'

'কলকাতা থেকেই বেরিয়েছিলাম। উজানে এসেছিলাম পাকের দাঁড়া বেয়ে বেয়ে। আজ যখন মর মর আবার তারই টান লেগেছে।'

'এ রকম কথা তো আর কখনও শুনিনি আপনার মুখে।'

'সৌম্য অনেক শুনেছে।'

আর নীরবতা।

বিমি ভাবলো : শান্ত হ'য়ে বরং ভাবাই ভালো। প্রশ্নটার কি উত্তর আছে? চেপে না রেখে বিশ্লেষণ করলে বোধ হয় উত্তরটা পাওয়া যেতো।

অজয় বললো, 'মোহিতের একটা গতি হ'লো। সুরথ যাচ্ছে দণ্ডকারণ্যে। আপনিও সব ফিরে পেয়েছেন। লতার কথা ভেবে শুধু দুঃখ হয়। ভেবেছিলাম হ'লো বোধ হয় ভালোই। কিন্তু ভয় হয়—নেশা যদি কেটে যায়। কিংবা নেশা কাটবার আগেই সব আশা যদি গুঁড়িয়ে যায় লতার?'

বিমি ভাবলো : একটা সাধারণ দিনেই এমন হ'লো। কাজেই ভুলে থাকবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। আজ যদি এমন হ'য়ে থাকে, যে কোন দিনেই এটা হ'তে পারে। এ কান্না তোমার জন্য তোলাই থাকবে। তা ছাড়া ওটা তো একটা অতীত জীবন। ওকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে! আর পেলেই বা তুমি কি করছো।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো বিমির।

অজয় বললো, 'মানুষের মনের বাঁধ কখন ভাঙবে তা বলা যায় না। সকালে আজ সুরথের বউ হঠাৎ কেঁদে ফেললো। বললো তার ছেলের কথা। বললো, আমি যেন তার খবর করি মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে যেন তাকে সে খবর দিই। আমি মোটেই জানতাম না সুরথের ছেলে আছে।'

কি যেন বলছে অজয়। তবে অজয় এসে ভালোই হয়েছে। শান্ত করেছে তাকে। আর প্রকৃতপক্ষে ও চোখের জল কার জন্যই বা? কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্যই নয় বোধ হয়। ঘটনাগুলোই। তা যদি না হয়, বলো, তোমার কি সাহস আছে কোন ব্যক্তিকে ফিরে পেতে? একটা ধূসর দিগন্ত যেন। মরু-তৃষার পিছনে ছুটতে ছুটতে বৃত্তাকার পথে পরিচিত সেই ভাঙা জলপাত্রগুলির কাছে পৌঁছে ভয়ব্যাকুল আর্তনাদ ক'রে ওঠা। তার পরই বোধ হয় মানুষ আশা আকাঙ্ক্ষাকে পার হ'য়ে এক ক্লান্তির অবসন্নতায় পৌঁছে যায়। এই ভাবলো সে।

অজয় অনেক কথা বলছে। বোধ হয় এটা তার মনের অস্থিরতা ঢাকবার একটা ছল। যেন বিমির সান্নিধ্যকে সে কাঙালের মতো চেপে ধরেছে। বিমি ভাবলো।...

হসপিট্যাল আবার। মহকুমা শহরের হসপিট্যাল। অযত্ন করেনি ওরা। একটা কেবিনে একা সে। লোহার ছোট খাটটিতে সাত দিনের শিশু। জান-

হীন ধোঁয়াচ্ছন্ন একটা আর্তভার মধ্যে কতদূরে থেকে যেন কান্নাটা ভেসে এসেছিলো। তারপর সাতদিন কেটে গেছে।

কেন যে আজ এ কথাগুলোই মনে আসবে। নাগকেশরের লাল পাতাগুলো যেন রেশমের মতো কোমল। কচি বোধ হয় কথাটা। শিশুর স্পর্শের মতো।

কেবিনের সামনে কয়েক সারি ডালিয়া। বসন্ত বোধ হয় সেটাও। ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে শীতের ফুলগুলি। আর সেগুলো বোধ হয় নাগকেশরই, হসপিট্যালের বেড়ার পাশে পাশে যেগুলি ছিলো। অজস্র লাল নতুন পাতা গাছে। ঝরা বাদামী পাতা গাছের গোড়ায় স্তূপ ক'রে রাখা যেন। পায়ের তলায় শুকনো পাতা ভেঙে ভেঙে যায় চলতে গেলে।

মেট্রন এলো। 'কেমন আছেন—ভালো? আপনাকে ট্যাক্সিতে ওরকম ছুটে আসতে দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। ও অবস্থায় ওরকম করতে নেই। যাক, এসে ভালোই করেছিলেন। কিন্তু একটা খবর আমরা পাইনি।' মেট্রন কুণ্ঠিত হ'লো।

'হেঁয়ালি নয়। যে নামটা বলেছি—ভুবনবাবু আমার ভগ্নীপতি।'

মেট্রন সরাসরি চাইতে পারলো না।

'না। সেও নয়। কিন্তু, আমি কারো বিবাহিতা স্ত্রী নয়, সাবালিকাও বটে।' হাঁপাতে লাগলো বিমলা।

বৃষ্টির অজস্র ধারার মতো ব'কে যাচ্ছে অজয়। ঠোঁট দুটিকে নির্দয় ভাবে দাঁত দিয়ে বিঁধে রাখলো বিমি। কোঁপানিটাকে চাপলো গলার কাছে। বুকটা ওঠা নামা করছে শুধু।

মেট্রন চ'লে গেলো। কেবিনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো বিমি। পায়চারি করতে লাগলো সে। চলতে তার কোনদিনই দুর্বলতা নেই। রেঙ্গুন বজ্রযোগিনীর পথ তাকে শক্ত ক'রে দিয়েছে। নাগকেশরের পাতাগুলি লাল। যতই দেখো ততই সুকুমার ব'লে বোধ হবে। লাল পাতাই ছিলো। আর তখন বসন্তও বটে।

কাঁচের জানলা ছিলো হসপিট্যালেরও। জানলার ওপারে তার শয্যা। সন্ধ্যার আগেই মৃদু আলোটা জ্বলছে। সাদা ধবধবে বিছানায় বাদামী নরম কম্বল। লোহার ছোট খাট। যেন ছবি। ঘুমন্ত শিশুটি দু'হাত তুলে রেখেছে মুখের সামনে। কোন কাল্পনিক বিপদ থেকে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নাকি ওটা।

বারান্দায় পায়চারি করছে বিমি। একটু শীত শীত যেন করছে। জানলার ওপারে কবোষ্ণ নিশ্চিন্ততায় সে ঘুমোচ্ছে।

বারান্দা থেকে লনে নামলো বিমি। আরও দু-একজন রোগীও বেড়াচ্ছে তার মতোই। কম্পাউণ্ডের বেড়াটার তার এদিকে খানিকটা ছেঁড়া।

বিমি কম্পাউণ্ডের বাইরে এলো। পথ ধ'রে চলতে গিয়ে ফেরারী আসামীর মতোই সে সতর্ক হ'লো। রাত হ'লো। হাঁটতে লাগলো সে। কোথায় যাবে? বাস্তহারা কোথায় যায়?

অজয় বলছে, 'দেখা হ'য়ে ভালো হ'লো। তেমন কিছু নয়। পত্রিকা বার করেছিলাম একখানা। সবাইকেই দিয়েছি। আপনাকে আর সৌম্যকে দেয়া হয়নি। দু'খানা আপনাকে দিয়ে যাবো। এই পাড়াতেই থাকেন?'

বিমি ভাবলো: কি সম্বন্ধ, বলো, সে জীবনের সঙ্গে আমার? লাইব্রেরীতে গিয়ে এমন হ'লো?

কানাতের উপরে জল পড়ছে পিট পিট করে। জমছে জল। জলের ভারে কানাত কাৎ হ'য়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়ে অবশেষে। তেমনি যেন অজয়ের কথাগুলো শুনতে পেলো বিমি।

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় এই দণ্ডকারণ্যের প্রস্তাব না এলেও এমন হ'তো? লতুর কথাই। মানে, চট ক'রে একটা সিদ্ধান্তই যেন নিতে হ'লো তাকে এই সঙ্কটে। তাই নয়? এই পথে যাবেন? নমস্কার। ভালো কথা মনে পড়লো। শুনুন। সৌম্যর একটা খবর দেয়ার আছে। যোগাযোগটা রাখতে পারিনি। অবশ্য কি ক'রেই বা রাখতাম। মাস তিনেক আগে চিঠি পেয়েছিলাম। কোন ঠিকানাই নেই চিঠিতে। শুধু ছাপ দেখে বোঝা যায় বিদেশ থেকে লেখা। কোন বিদেশ তা ব'লেও লাভ নেই। লিখেছিলো— অজয়বাবু, কাল সকালেই বোধ হয় রাজঅতিথি হবো। কতদিনের জন্য কে জানে। আপনাদের খবর জানতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঠিকানা দিতে পারছি না। যদি অতিথিশালায় থিতু হ'য়ে বসি আর সুযোগ যদি পাই চিঠি দেবো।'

বিমি সংবাদগুলো মনে মনে আওড়ালো। কিছু যেন অনুভব করছে না আর।

'এই রকমই সৌম্য।' বললো অজয়, কি দরকার ছিলো বিদেশে পাড়ি জমানোর। কি দরকার ছিলো সেখানে গিয়ে তাদের সমাজ নিয়ে বিবাদ করার? যাক, সেটা তার মাথাব্যথা। আমার ধারণা হয়, কল্পনাও বলতে

পারেন, যদি কখনও সে এদেশে আসে হয়তো বাপ মায়ের খোঁজ করতে হলুদ-মোহনে আসতেও পারে। আপনি কাছে রইলেন। যদি দেখা হ'য়ে যায়, হয় এমন দেখা, আজই আপনার সঙ্গে হ'লো আমার, ওকে লতার কথা বলবেন। যদি কোন হিল্লে করতে পারে, ক'রে দেয় যেন। আমরা যা পারবো না, ও পারবে। আর—অবশ্য তা না ব'ললেও চলে। বাপ মায়ের খোঁজ এখানে না পেলে ও নিশ্চয়ই বোনের বাড়ি যাবে। বাপতো গেছেই। ছেলের শোকে ব'লেই আমার ধারণা। মা যদি থাকে দেখা হবে।······ আচ্ছা চলি।'

বিমলা কিছুই অনুভব করতে পারলো না। আর একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবার মতো হ'লো। মুখে আঁচল চাপা দিলো সে।

এখন বোধ হয় তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। গুহার অন্ধকারে কত প্রাণীইতো ক্লান্ত দেহ নিয়ে টলতে টলতে ফিরে যায়।

কেন এমন হয়!

॥ সাত ॥

রাতটা কেটেছে।

সকাল সকালই উঠেছে বিমি। তার মনে হ'লো কি কি যেন ঘটেছিলো রাত্রিতে।

ভুবনবাবু বলেছিলো, ভুবনবাবুই বৈ কি, সে ছাড়া এ বাড়িতে পুরুষ কে : বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। ক্লান্ত ? একটু জিরিয়ে নাও। মালতী তার বাড়িতে গেছে ব'লে আসতে। রান্না চাপায়নি, উনুন ধরিয়েছে। ব'সো। চা ক'রে আনবো ? না। তা হলে বরং দু'জনে মিলেই যাই ওদিকে।

ও মা, বউদি, রান্না চাপিয়ে দিয়েছো এরই মধ্যে ! কন্মা বটে। কোথায় গিয়েছিলে ? বেড়াতে ?—অন্ধকার রাত।

কুপির আলোর ধোঁয়ায় রান্নাঘরের অন্ধকার কাঁপছে। উনুনের মুখের কাছে আভা। চৌকাঠের কাছে ব'সে মালতী।

কিন্তু কেউ কি হেসেছিলো খিলখিল ক'রে, কিংবা কে যেন আহত হ'য়ে কাউকে আঁচড়ে দিয়েছিলো ? এগুলো সম্ভবত বিমির ভুল। কখনও কখনও যা করিনি তাই করেছি ব'লে মনে হয়।

তখনও বাসি কাপড় ছাড়া হয়নি, মালতী এলো।

'তুমি আসবে জানতাম। উনুনে আঁচ দেয়া হয়েছে। চলো চা খেতে খেতে গল্প করবো। ভুবনবাবু আজ ঘুমুচ্ছে এখনও।' বিমি বললো।

'রাতে ভালো ঘুম হয়নি বোধ।'

'হুঁ। কাল যেন গরম পড়েছিলো। মেঘ ছিলো নাকি আকাশে ?'

কাপড় পালটে রান্নাঘরে এসে বিমি দেখলো মালতী কেটলিটা বসিয়ে দিয়েছে।

মালতী বললো, 'বউদি, খবর শুনেছ ?'

'কি খবর ?'

'ওদের যেতেই হবে। কাল সকালেই যাবে।'

বিমি আত্মগতভাবে বললো, 'তুমি হয়তো জানো না, মালতী। রাজনৈতিক নেতারা তোমার সঙ্গে রসিকতা করেনি তো ? আন্দোলনের ব্যর্থতা হয়তো আগেই বুঝেছিলো তারা।'

'কিছু বললে, বউদি ?'

'যাবেই তো।' বিমি বললো। যাওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে মনে হ'লো : কাল রাতে মেঘ যদি থেকেও থাকে আজ তা নেই। পরিষ্কার লাগছে আলোটা, কেমন যেন তীক্ষ্ণও।

মালতী বললো, 'কি লাভ হ'লো আমার পরিশ্রমের ?'

'লাভ কি সব সময়ে হয় ?' বললো বিমি। ভাবলো সে : মেয়েটা শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণ দুটি লাল। ধুলো লেগে? রাতেও ঘুম হয়নি। রাতের ঘুমে হয়নি। রাতের ঘুমে কি যায় ? বললো, 'আজ কোথাও যাবার তাগিদ আছে নাকি ?'

'গেলেও হয়, না গেলেও চলে।···তোমার মুখটা শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণ দুটি লাল। ধুলো লেগে লেগে ? রাতে ঘুম হয়নি।' বললো মালতী।

খালি চায়ের কাপটাকেই যেন একমনে পরীক্ষা করছে মালতী। তার সুন্দর সুপুষ্ট আঙুলগুলি কাপটার গায়েই চ'লে বেড়াচ্ছে।

বললো সে, 'আত্মহত্যা করেছে, শুনেছো ?'

'কে ?' বিমলার হৃৎপিণ্ডটা যেন থমকে দাঁড়ালো। 'কার কথা বলছো ?'

'লতা বউদি নয়। সে যে মেয়েটাকে স্থানচ্যুত করেছিলো, সেই। কিছু হৈ-চৈ হবে এ নিয়ে। কাল রায়মশায়ের কাছে পুলিশের কেউ এসেছিলো।'

ঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছে মালতী। এমন কর্মঠ মেয়েরও যেন আর কিছু করার নেই।

মালতীই বললো আবার, 'রায়মশায় লতাবউদিদের আত্মীয় তা জানতাম না। কাল তোমার বাড়িতে ব'সেই রায়মশায় বলছিলেন এসব কথা। বুড়ো হ'লে পুরনো কথা বোধ হয় মনে পড়ে। লতাবউদির বাবা গিরীশবাবু রাজনীতি করতেন। উনিশ শ' দশ থেকে উনচল্লিশ। এর মধ্যেই একুশ বছর কেটেছিলো তাঁর জেলে। উনচল্লিশে আন্দামান থেকে ফিরে এলেন তখন পক্ষাঘাতে বাঁ অঙ্গ প'ড়ে গেছে। স্পষ্ট ক'রে কথাও বলতে পারেন না। শুনলেন গাঁয়ের কেউ কেউ তাঁকে বলে গিরীশ ডাকাত। রায়মশায় চিনতেন তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবেই। পুলিশের ঝামেলা তাঁকেও ভোগ করতে হ'তো, কারণ তিনি পুলিশের চাকরি করতে করতে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গের হুজুগে। আর একটু চা দেবে, বউদি ?'

কেটলিটা উনুনে বসালো বিমি।

মালতী বললো, 'তা হ'লে গিরীশের মেয়েই লতাবউদি। গিরীশ যখন ফিরলেন তখন লতাবউদির বছর এগারো হবে। বাপ সেই প্রথম মেয়ের মুখ দেখলো। এরকমই হবে কারণ গিরীশবাবু আন্দামানে দশ বছর ছিলেন পক্ষাঘাতে অসাড় হওয়ার আগে। আ, বউদি, তোমার তরকারির ঝুড়ি এঁটো ক'রে দিলাম। চা খেয়ে জলে হাত দিই নি।'

'রসো চা করি আবার।' বললো বিমি। অনুভব করলো—কি যেন ভাবছিলাম? ভাবলো: মালতীকে এমন ক'রে কথা বলতে আর কখনও শোনে নি। যেন গলা মোম, জলের উপরে প'ড়ে প'ড়ে—কিম্বা যেন চৈত্রের বাতাস গাছ থেকে জীর্ণ পাতাগুলিকে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

মালতী বললো, 'আর বেয়াল্লিশে এসে আই বি. র দারোগা মোহিতদার কাজ হ'লো, বোবা হ'লো কিন্তু তাহ'লেও স্বদেশী গিরীশের চালচলনের খোঁজ রাখা। শেষের দিকে গিরীশের বাড়িতেই অনেকটা ক'রে সময় কাটতো মোহিতদার।'

'আচ্ছা, মালতী,' ব'লে শুরু করলো বিমলা, কিন্তু আঁচল জড়ো ক'রে কেটলিটা ধ'রে উনুন থেকে নামিয়ে প্রশ্নটার জবাব সে নিজেই দিলো। বললো, 'বিয়ের আগে লতা অবশ্যই জানতে পেরেছিলো, আর গিরীশবাবু তারও আগে—মিহিরের পুলিশি চাকরির কথাই বলছি। তাই স্বাভাবিক নয়?'

মালতী বললো, 'খুবই স্বাভাবিক। গিরীশবাবুর পক্ষে কারো আর্থিক সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব ছিলো না।'

চা করলো বিমলা। মালতী নির্বাক চেয়ে রইলো জলন্ত উনুনটার দিকে। বাতাসটা যেন সেখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য হ'য়ে কাঁপছে, যেন দর্শনীয় কিছু।

'উঠছো?'

'ভালো লাগছে না।'

'ভুবনদাকে ডেকে দেবে নাকি যেতে যেতে?'

'দিই।'

মালতী চ'লে গেলো। মেয়েটা অস্থির হয়েছে। নিস্পৃহও যেন।

ভুবনবাবু হাত মুখ ধুয়ে জামা গায়ে এলো বিমির কাছে চা খেতে। যেন সে তখনই বেরুবে কোথায়।

'কেন ?' চা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো বিমি।

'কাল সন্ধ্যায় র‍্যাশান আনার কথা ছিলো। আনা হয়নি। দেখি যদি আজ সকালে দেয়।'

'ও, আচ্ছা।'

এটুকুই কালকের জের আছে। ভুবনবাবু র‍্যাশান আনতে গেলো।

আজকের রোদটা খুব উজ্জ্বল। শীতের অস্পষ্টতা গ্রীষ্মের প্রখরতাও নয়। একটু তরুণ দীপ্তি যেন। যেন কোন তরুণ তাপস। যার কমনীয়তা এখনও আছে। তপস্যার রুক্ষতা ভাস্বর করেছে। কিন্তু মরি, মরি, কি তরুণ কান্তি! বৈশাখের জটাজুট সমন্বিত রৌদ্র দীপ্তি নয়। কিন্তু তুলনাটা আর টানা যায় না। বর্ষাকালে তা হ'লে তাপসের কোন রূপ? মানুষ উপমা দেবে ব'লেই তো কাল নয়। তার চাইতে উপমাহীন ঋতু পরিক্রমা ভাবাই ভালো। পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপরে হেলে ঘুরছে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিমি ফিরে এলো।

নিজের শোবার ঘরে এসে একটু দাঁড়ালো সে ইতস্তত করার ভঙ্গিতে। কুলোয় ক'রে চাল ঢেলে নিলো। আঁচটা জ্ব'লে যাচ্ছে উনুনে।

তপস্যা—এই কথাটা তার মনে ফিরে এলো। তপস্যা আর কষ্ট। কষ্ট করাই কোন কোন ক্ষেত্রে তপস্যা হয়ে ওঠে না কি? কালকের সন্ধ্যায় লাইব্রেরির সেই ছেলেগুলি তাদের খেলাধুলো, স্বাভাবিক চঞ্চলতা থেকে স'রে এসে বই পড়ছিলো। তপস্যা নাকি তাদের?

তপস্যা আর জেদ। অনেকের জেদ থাকে। লতার বেশ খানিকটা ছিলো। কিন্তু মালতী যেন তাকে অন্য কিছু হারিয়ে যাওয়ার উদাহরণ হিসাবে নিয়েছিলো। অজয় বোধ হয় বলেছিলো নেশার কথা। মেয়েদের মন আর শরীর কি আলাদা রাখা যায়। ভালো লাগার অভিনয় করতে করতে অভিনয়টাকেই ভালো লেগে যেতে পারে?

কি হয় তপস্যায় বলো?

এ ধরনের কথা আগে অনেক শোনা যেতো। ক্যাম্পে কারো কারো মুখে, এই কলোনিতে এসে অনেকের বিশেষ ক'রে রায়মশায়ের আলোচনায়। এই বাস্তহীন দুর্দশায় আজ যারা তাদেরও অনেকে অনেক দিয়েছে—হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করা সে দান। আজ আবার দণ্ডকারণ্যের প্লাবনে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এই কথাগুলি কি অনেক কথার মধ্যে সোচ্চার হ'য়ে উঠবে? দীর্ঘ দিনমান

তারাও তপশ্চারণ করেছে, সে তপস্যা কি ব্রাত্যের তপস্যার মতোই মূল্যহীন? কিম্বা এ যেন কোন অভিনব পুরান-কথা: নদীর দুই তীরেই তপস্যা হয়েছিলো। সিদ্ধিও এলো। কিন্তু এক তীরকে বঞ্চিত ক'রে অন্যতীরের ভাগ্য সবটুকু সিদ্ধিকে আত্মসাৎ করেছে?

কিম্বা গিরীশবাবু—তার কথা মালতী যা ব'লে গেলো? এই কথাটা ভাবতেই যেন তার মন প্রস্তুত হচ্ছিলো তপস্যার কথা ভুলে ভুলে।

বিমি ভাবলো—কাঁদবো কেন তা তো বুঝি না।

আর লতা। মোহিত বলে তপস্যাই ছিলো সেটা লতার।

নাকি লতা আলো বাতাসের অভাবে হাঁপিয়ে উঠেছিলো? নিজের তপস্যায় বন্দী ছিলো সে? ধরা পড়াই নিয়তি এ জেনেও দীর্ঘ মেয়াদী হঠাৎ একদিন যেমন পাগলামি করে বসে?

আর সৌম্য? এ কি কারাগার খুঁজে খুজে ফেরা? কে মূল্য দেবে তোমার এই তপস্যার? কে তোমার যশোগান করবে?

কাল কিন্তু এ সবই ভেবেছে বিমি। নতুন হ'য়ে ওঠা, তপস্যা, এমন সব ব্যাপারই। কি লাভ হয়েছে ভেবে?

রাজপথটার উপরে শব্দ হ'লো। কনভয়? এ পথে অনেক কনভয় যেতো বটে। জানলার পাল্লাটা মেলে দিলো বিমি। একি কালকের বাসগুলো নয়? একখানা, দুখানা…পাঁচখানা। সব আগের গাড়িটা কোথায় গিয়ে থামলো? কিন্তু পর পর বাসগুলো আসছে আর থামছে। বাস, বাস, ট্রাক, বাস। দেখতে দেখতে গোটা ক্যাম্পের দৈর্ঘ্য জুড়ে দাঁড়িয়ে গেলো তারা। যেন প্রাকার তৈরী হ'লো একটা, পৃথিবী আর ক্যাম্পের মধ্যে। কিন্তু আজ কেন? কাল যাবার কথা ছিলো না? বিমি অন্তরে অন্তরে কেঁপে উঠলো। কি ঘটবে এই প্রাকারের আড়ালে? অ্যাঁ, কি ঘটবে?

ভেবে সে কি করছে? মালতী তো কত ভাবলো। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ঠিক খবরটাও আনতে পারেনি সে। আজই যাবে। অথবা ঠিক খবরই সে পেয়েছিলো। গোলমাল এড়ানোর জন্যই একদিন আগেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন যে ভয়, বুঝি না। কেউ কি তাকে টেনে নিয়ে যাবে ঘর থেকে? কেন যাবো? গিয়ে কি হবে? কি লাভ?

বিমি পেটের কাছে একটা সঙ্কোচ-প্রসারণ অনুভব করলো। এই আক্ষেপটাই বুকের কাছে উঠে আসে, বুক তোলপাড় ক'রে ওঠে। সে

জানে। নিজের সম্বন্ধে বোধ হয় কিছুই তার অজানা নেই। বিক্ষোভই বোধ হয় কথাটা, ভুল নয়। থর থর ক'রে বুক কেঁপে ওঠে।

'আচ্ছা, ভুবনবাবু', ভুবনবাবু খেতে বসেছে, বললো বিমি।

'কিছু বলবে?'

'দরকারী কথা নয়। বেদেদের কথা বলছি।' সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টায় হাসলো বিমি।

'বেদে? যারা ছোট ছোট তাঁবু আর বুড়ো ধুড়ো দু-একটি ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?'

'হ্যাঁ। পথ চলতে চলতে পথের ধারেই কোন প'ড়ো বাগানে আশ্রয় ক'রে নিলো। তারপর আবার একদিন এগিয়ে চললো। কেনই বা থেমেছিলো আর কেনই বা এগিয়ে গেলো তা বোঝা যায় না। শিশুরা জন্মাচ্ছে, বৃদ্ধদের মৃত্যু হচ্ছে। তারা যেন খুঁজে ফিরছে কিছু। বৃদ্ধের মৃত্যু হ'লো। উদ্দেশ্য তার সঙ্গে ফুরিয়ে যায়? শিশু জন্মালো। উদ্দেশ্যটার সে কিছুই জানে না। তবু তারই পিছনে চলেছে। কেন এমন হয়?'

'ওই ধারা ওদের।'

'হ্যাঁ, ভুবনবাবু, তুমি দেখেছো? নদীর চরে চরে চাষ করার একটা ঝোঁকও আছে কোন কোন চাষীর। সব চরে ফসল হয় না। বরং ঝড় উঠে পড়ে কখনও, নদীর কালো জল তার নড়বড়ে কুটিরের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ ক'রে আঘাত দেয়। তবু তার চরের মায়া কাটে না।'

'সেও যাযাবর। কিন্তু ওদের কথা কেন বলছো?'

'কি জানি!' ব'লে ভাবলো বিমি।

নিস্তব্ধ দুপুর। ভুবনবাবু খেয়ে ঘরে যাওয়ার অনেক পরে এই স্তব্ধতা এসেছে। অনেকদিন হয় না কাজটা। কোনদিন কি বিশেষ দিন হ'য়ে আসবে যে তার জন্য রেখে যাওয়া। বিমি নিজের ঘরখানা ঝাড়তে সুরু করেছে। প্রায় শেষ হয়েছে ঘণ্টাটেকের চেষ্টায়। দেয়াল ঝেড়ে, জিনিসপত্র এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে। কোণগুলিতে নিজেকে সংকীর্ণ ক'রে প্রবেশ করে, চৌকির তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে। মনে মনে বললো সে—কি জানি কেন বলি এসব কথা।

পরিশ্রম হয়েছে। চুলে মাকড়সার সুতো লেগেছে, গায়ে ধুলো। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক ক'রে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বুকটা মৃদু মৃদু ওঠা নামা করছে।

এবার স্নান করতে হবে। বাঁশের আড় থেকে গামছা নিয়ে সে মুখ নিচু ক'রে স্নানের ঘরে গেলো।

এ রকম হয় কোন কোনদিন, জলস্পর্শ করতে একটা অনিচ্ছা। দেহটা তপ্ত হ'য়ে আছে কিন্তু তাপদগ্ধ নয় যে জলের শীতলতা কাম্য হ'য়ে উঠবে। বরং জল যেন দেহের স্পর্শকাতরতাকে জাগিয়ে তুলবে।

স্নান-ঘরের দেয়ালগুলো বাঁশের, কিন্তু সিমেন্টের চৌবাচ্চাটা বেশ বড়োই। গভীর নয় খুব, কিন্তু চওড়া। চৌবাচ্চার দেয়ালের উপর বসলো বিমি। অন্তমনস্কভাবে জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নজর পড়লো নিজের ছায়ার দিকে। জলটা স্থির। অঙ্গের ছায়া ধরেছে।

ছায়ার দিকে চাওয়াটাও অন্তমনস্কভাবে। আকস্মিক একটা নির্দয়তা যেন গ্রাস করলো। যেন চারিদিকের প্রকৃতি থেকেই একটা রূঢ় নির্দয়তা তাকে গ্রাস করলো। বুকের কাপড়টা স'রে গিয়েছিলো। অনাবৃত করলো সে। কোমল সুঠাম স্নেহভারানত বুক দুটি ; কিছুটা উদ্ধত, কিছুটা যেন রোদনমুখী। বুক, কুক্ষি, জঙ্ঘা। অশ্রু যেন বাইরে আসার পথ পাচ্ছে না। একি করছে সে। ফোঁপানোর মতো দমকে দমকে তার মনে হ'তে লাগলো—এর চাইতে কাঁদা ভালো, কাঁদা ভালো।

সম্বিৎ পেয়ে ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঝপ ঝপ ক'রে জল ঢাললো বিমলা। গা মুছলো কি মুছলো না। কাপড় পালটে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকলো। ভিজে চুল বেয়ে টপ টপ ক'রে জল পড়ছে। জামা পরার সময়ে চোখ বুঁজে রইলো সে, আয়নাতে মুখও দেখবে না।

দুপুরটা কি ক'রে যেন কাটলো। কাটবে দুপুর তা যেন মনে হয়নি। হিংস্রতার মতো, আদিমতার মতো একটা উত্তাপ যেন অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কি যেন নেই। অন্ধ সে, জড় সে, তার দেহ নেই, মুখাকৃতি বোঝা যায় না, একটা শিশু যেন। যেন ভ্রষ্ট ভ্রূণ। কি যেন একটা অনুশোচনা। তাকে অস্বাভাবিক চাপে রেখে বিকলাঙ্গ ক'রে দেয়া হয়েছে। আর তাকে চেনা যাবে না। চেষ্টা করলে আর তার স্বরূপ ফিরিয়ে দেখা যাবে না মুহূর্তের জন্ম। ইচ্ছার মতো মুখ নিয়ে সে ফুটবে ব'লে মনে হয়। আবেগের মতো পিণ্ডাকার হ'য়ে যায়। যেন অনুচ্চারিত শোক, যেন কান্না হ'তে পারতো।

বিমি নিজেকে প্রবোধ দিলো। শক্ত হ'তে বললো। স্বগতোক্তি করলো—না না বিমি, শক্ত হও ; কি লাভ ভেবে ?

শব্দ হচ্ছে রাজপথে। মোটরের হর্ন। স্টার্টারের শব্দ। অনেক লোকের একসঙ্গে বলা কথার প্রতিধ্বনি।

বিমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। এ তো বোঝাই যায়। বাসগুলি এগিয়ে পিছিয়ে বোধ হয় ব্যূহটাকে জোরদার করছে।

হাতের দিকে নজর পড়লো হঠাৎ। একি বালা দুটো কোথায়? মনে পড়লো দুপুরে যেন এক সময়ে খুলে ফেলেছিলো। কেন তা করলো?

লোক আসছেই দেখো, লোক বাড়ছেই। দেখতে আসছে? মানুষ দুঃখের কথা বলতে ভালবাসে, শুনতেও। দুঃখ ভোগ করতেও নাকি? ভালবাসা নয় বোধ হয়; এমন হ'তে পারে মন্ত্রের মতো কোন অদৃশ্য প্রভাব আছে দুঃখের। এটাই হয়তো উত্তর। হয় তো তার টানেই মানুষ যাযাবর হয়।

মালতী নয়? কয়েকজন সুবেশ তরুণ, না প্রৌঢ়ও আছে দু-একজন। ওদের পার্টি নাকি? ধবধবে পাঞ্জাবিগুলোর ফ্রেমে আঁটা মালতীর অনেক ব্যবহার করা সাদা মাটা শাড়ি। ব্যবহার করা মেয়ে।

ভুবনবাবু এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

'যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

দুপুরেই তারা রাত্রির রান্না শেষ করেছে। প্রস্তুত হয়েছে যাত্রার জন্য। কিন্তু তাড়াতাড়ি কি পারছে? অজ্ঞাতের দিকে পা বাড়াতে যে দ্বিধা সেটা বিমূর্ত না হ'লেও আছেই তো। বিকেলের সময় পার হ'য়ে যাচ্ছে। কোন কোন গাড়িতে কিছু কিছু লোক উঠে বসেছে। কিন্তু সব গাড়িই যেন খালি এখনও। যারা উঠেছে বাসে তারাও উৎকণ্ঠায় অস্থির যেন। ওঠা নামা করছে। নেমে যেন মাটি স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে। বাসটাকে দেখছে ঘুরে ঘুরে। নিচু হ'য়ে তার চাকা। গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

আজ সময় কোথা দিয়ে কাটবে কে জানে। এখনই আলো ধূসর হ'য়ে গেছে। সময়ের কোন ধারণাই আজ অবশিষ্ট নেই।

বিমলা বারান্দা থেকে নেমে রাজপথের ধারে এসে দাঁড়ালো।

নতুন একদল যাত্রী বেরিয়ে আসছে ক্যাম্প থেকে। আজ তারা আর কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে চলাফেরা করবে না। সদর দরজার কাল্পনিক পরিস্থিতিটাকেই সম্মান দিচ্ছে। কাঁদে নাকি? না-না। উলু দিচ্ছে। কান্নার মতো শোনালো। উলু দেয় কেন?

বন্যা! বন্যা কি সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ হয়? ধীরে ধীরে জল বাড়তে থাকে। রাত্রির আঁধার নামে। পাক বাড়ে। ডাক ওঠে জলের। তারপর শোনা যায় মানুষের হাহাকার। তারপর জলও হাহাকার করতে থাকে অন্ধকার আকাশের নিচে।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো ইতিমধ্যে।

মালতী নাকি? মালতী তার দল থেকে একটু স'রেই দাঁড়িয়েছে। বরং বিমলার থেকেই কাছে। জপ করছে? দেখো রাজনীতি করা মেয়ে ভয় পেয়ে জপ করছে। ফিরিয়ে আনব, ফিরিয়ে আনব, ফিরিয়ে আনব। মালতী অস্ফুট কণ্ঠে, চোখের জলে মিশিয়ে আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে।

দুর্বল হ'য়ে লাভ কি? বিমলা হাঁটতে সুরু করলো বাসগুলির দিকে। বরং কথা বলা ভালো। অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, কাছে না গেলে মানুষ চেনা যায় না।

হলুদমোহন এর আগেও উদ্বাস্তু দেখেছে। ওই প্রান্তরটারই হলুদমোহন নাম ছিলো। সেই সেবার হাওয়া জাহাজের মাঠ করা হয়েছিলো। গ্রামবাসীরা সেদিনও এমনি গিয়েছিলো দল বেঁধে।

চেনা মুখ যাদের তাদের কারো কারো সঙ্গে কথা বললো বিমলা।

বাসের ভিতরের অন্ধকার যেন অজ্ঞাত কোন পৃথিবী। যেন ভবিষ্যতের গর্ভ। বাইরে তবু আলোর রেশ আছে।

'আলোটা বাড়িয়ে দিলেও পারতো।' বললো বিমলা।

'দিবে। গাড়ি ছাড়লে ওজল হবে।' কে একজন বললো গাড়ি থেকে উদাস স্বরে।

বিমলা বাসের লাইনের গোড়ায় চ'লে এসেছিলো। আবার এগোতে লাগলো।

'শ্রীকান্ত?'

'মা ঠাকরুণ।'

'বিন্দা কই?'

'এই যে হাতে ধরা।'

ম্লান অন্ধকার। বিন্দা তার এক মাসের শিশুটিকে জড়িয়ে ধ'রে আছে, আর শ্রীকান্ত তার বাহু স্পর্শ ক'রে দাঁড়িয়ে। শ্রীকান্তর মুখ সাদা হ'য়ে গেছে। বিন্দা থর থর ক'রে কাঁপছে।

'যাচ্ছ ?'

'যাই, মা ঠাকরুণ, আশীর্বাদ করেন।'

'মরণচাঁদকে দেখেছ ?'

'এদিকেই আসছে। দেখা শোনা করতেছে সকলের সঙ্গে।'

'যাবে না ?'

'জান নে।'

গলার স্বর ওঠানামা করলো না, যেন মুখস্ত করা কথাগুলি বলছে শ্রীকান্ত।

বিমি আবার হাঁটতে সুরু করলো।

মরণচাঁদ এখনও মনঃস্থির করতে পারেনি। বিন্দা নতুন হ'তে চলেছে ? কোলে কি তার নতুন জীবনের শ্বাস ?

শ্রীকান্ত ঠিকই বুঝেছে এই পুরনো মাটিতে বিন্দার যদি আবার কোলকাতার মোহ জাগে ? মরণচাঁদ তার মাসির ছেলেকে কোলে ক'রে এই অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়ে কি করবে। কিন্তু বিন্দা কাঁপছে কেন ?

একি, বাস ছাড়লো ? একটু যেন দুলে উঠলো বাসের লম্বা লাইনটা। উঠে পড়ো তোমরা। এ মাটি আঁচলে বেঁধে কি হবে ? উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। কেউ যেন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

সবগুলি নয়। লাইনের একেবারে মাথায় পর পর দুটো ছেড়ে গেলো। অন্যগুলো স্টার্টার চেপে চেপে পরীক্ষা করছে। কতবার তো দেখা হ'লো। ড্রাইভারও যেন অকারণে নার্ভাস হ'য়ে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো বিমি। পরিচিতদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়নি। মরণচাঁদ কোথায় থাকলো ? সুরথ ? বেশ বোঝা যায় সুরথের মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ। আর সতী বোধ হয় শিশুকে প্রবোধ দেবার মতো তার ভয়কে দূর করার চেষ্টা করছে। বাসের ভিতরে যেমন বাইরেও তাই—স্ত্রী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, শিশু ভিড় ক'রে আছে। লোক চিনতে হ'লে ঠেলে ঠেলে এগোতে হয়।

তৃতীয় বাসটাও ছেড়ে গেলো।

মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। নতুন হ'য়ে ওঠো।

চতুর্থ বাসটাও ন'ড়ে উঠলো। সব লোক ওঠেনি। হুড়দাড় ক'রে, গুঁতো খেয়ে কোন রকমে উঠে বসলো তারা। কয়েক পা এগিয়ে গেলো কয়েকটি

লোক বাসের সঙ্গে সঙ্গে। দর্শক? বিমিও কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলো। এবার পিছনের বাসটার কাছে।

সবগুলিকেই এরকম ক'রে রওনা ক'রে দেবে? তারপরে একখানা বাসও থাকবে না।

যেন তরঙ্গ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে লাগছে অন্ধকারের তটে। টলমল ক'রে উঠছে অন্ধকার। অন্ধকারের মতো একটা ঢেউ লাগছে রক্তে।

এ কি? মরণচাঁদের ছেলে না? একা দাঁড়িয়ে কেন? তা হ'লে? তা হ'লে? ধক্ ক'রে উঠলো বিমলার বুক। একা কেন? একা কেন? বাস ছাড়ছে যে। মরণচাঁদ কি শেষ পর্যন্ত ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে? পরের ছেলে বুঝি? মাসির? চুরি করা? হসপিট্যাল থেকে কুড়িয়ে আনা, তাই?

বাস গোঁ গোঁ ক'রে উঠছে।

ওঠো, ওঠো; উঠে পড়ো তোমরা।

ছেলেটির হাত ধ'রে চলন্ত বাসে উঠে পড়লো বিমলা।

অন্ধকার বাস। আলো জ্বালাবার চেষ্টা ক'রে মৃদু লাল আভা একটা ফোটাতে পারলো বালবের গায়ে। মানুষগুলিকে চেনা যাচ্ছে না। কথা নেই কারো মুখে। কে যেন উলু দিতে গিয়ে থেমে গেলো। কান্না হ'য়ে গেলো সেটা। বিমলার শক্ত লোহার মতো মুঠিতে হাত চেপে ধরলো ছেলেটির। কাঁদছে ছেলেটা। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে সে। বাস ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। পথটা অসমান। বোধ হয় গুঁতো খেলো কেউ কেউ। কুৎসিত ভাষায় কে গালি দিয়ে উঠলো। আরও কেউ কেউ কাঁদছে।

বিমলা হাঁপাতে লাগলো। অন্ধকারে পাশের বউটা বুক আলগা ক'রে সেখানে তার ছেলেকে টেনে নিলো। বিমলাও কি তাই করবে নাকি? হাঁটুটা টাটাচ্ছে ব্যথায়। উঠতে গিয়ে গুঁতো লেগে থাকবে। মরণচাঁদ যায়নি এমন হ'তে পারে। কিন্তু এর যে যাওয়া দরকার। ছেলেটিকে বুকের উপরে চেপে ধরলো বিমলা।

ঝাঁকি দিচ্ছে বাস। উঃ। ড্রাইভার কি এপথে নতুন? কিংবা নিচে থেকে রাজপথকে যতটা সমতল বোধ হয়, তা নয়। বন্ধুরতায় ধাক্কা লাগছে যাত্রীদের।

দুলছে বিমলা। হাত ছাড়াতে না পেরে তার কোলে মুখ রেখে কাঁদছে ছেলেটি। অনেকেই কাঁদছে। অন্য অনেকে কাঠ হ'য়ে ব'সে আছে।

আলো কেন হচ্ছে না? কুৎসিত ভাষায় গালি সুরু হ'লো আবার। আলো, আলো। আর্ততারও যেন তরঙ্গ আছে। আর এক ধমক এসে পড়েছে। একি আকুতি? আলোতে কি সব ভয় যায়?

ড্রাইভার হঠাৎ গাড়িটা থামালো। কেউ নেমো না যেন গাড়ি থেকে। আলো ঠিক করবো। পিছনের দরজা খুলে সে গাড়ির ভিতরে উঠলো। বালবটা বদলাবে। যেটুকু আলো ছিলো তাও নিবে গেছে।

পিছনের দরজাটা খোলাই। নিঃশব্দে নেমে পড়লো বিমলা ছেলেটির হাত ছেড়ে। আর কে যেন নামতে যাচ্ছিলো। ড্রাইভার ধমকে উঠলো— এইও ধরো তো ওর হাত। কে যেন ছেলেটার হাত চেপে ধরলো। কাঁদলো ছেলেটা। এইও, চুপ। ধমকালো ড্রাইভার।

এবার আলো জ্বলেছে বাসে। হু হু ক'রে সেটা বেরিয়ে গেলো।

পথে আলো পড়েছে। পরের বাসটাও আসছে বোধ হয়। বিমলা পথের একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। শহরের বাইরে। পথের ধারে আগাছার জঙ্গল। অন্ধকারও আছে।

* * * *

কত হ'লো রাত? খুব বেশি হয়েছে কি?

ভুবনবাবুকে বিমর্ষ দেখালো। পর পর দু-রাত বিমলা ফিরতে দেরি ক'রে ফেলেছে। কাল মালতী এসেছিলো। আজ সেও আসেনি।

বিমলা বললো, 'না। দরজা দিয়ে দাও। তুমিও এসেই গেছ। আজকের মতো বাইরের সঙ্গে চুকে গেছে আমাদের।'

সে হাসলো ভুবনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে।

'কিছু বলছো না যে?'

'কি বলবো?' ভুবনবাবু বললো।

'কেন, ফিরতে দেরি করলাম। তার জন্যে ধমকে দিতে পারো না। কেন তুমি তা দেবে না?'

'ব'সো। হাঁপাচ্ছ এখনও।' ভুবনবাবু বললো।

রান্না করেছে বিমি। ভুবনবাবু খেতে বসেছে। রাতও হয়েছে। কাল স্কুলে যেতেই হবে। পিছন ফিরে উনুনের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে বিমলা। তার গা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ম্যানেজার ডেকে বললো, 'তোমাকে বরখাস্ত করা হ'লো বিমলা। তুমি তিনদিনের মধ্যে কোআর্টার্স ছেড়ে দেবে।

আপনি নয়, তুমি। তিনদিন।'

সে গেলো শ্রমিক সংঘের প্রধান কর্মকেন্দ্রে। চা বাগানের আওতার বাইরে, মহকুমা শহরে। এ অঞ্চলের পুরনো ইউনিয়নগুলিকে স্থানচ্যুত ক'রে নতুন ইউনিয়ন স্থাপন করার জন্য তিনি রাজনীতি থেকে দু'পা সরে এসে এই মহকুমা শহরে বাস করছেন। সফলও হয়েছেন। অনেক বাগানেই ছোট ছোট ইউনিয়ন স্থাপন করতে পেরেছেন। সোয়েথয়েটেও হ'লো। খেজুর গাছের গায়ে বটগাছকে পরগাছা হ'য়ে বসতে দেখেছ ?

বিমলা হাসি হাসি মুখেই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনও বিশ্বাস ছিলো সংঘ-নেতা এত ধর্মঘটী শ্রমিককে কাজে রাখতে পারছেন, তার বেলায় কি এমন কঠিন হবে কাজটা।

বিমলা বললো, 'আমার চাকরি গেছে শুনেছেন ?'

নেতা অতি ভদ্র ভাষায় অতি মৃদু কণ্ঠে যা বললো তার সারমর্ম এই রকম : চাকরি কি থাকে ? শ্রমিক নেতৃত্বকে কর্তৃপক্ষ কখনও বরদাস্ত করে না। তার নিজের চাকরিও একদিন এমন ক'রেই গিয়েছিলো। বড়ো চাকরিই সে করতো। সাত আটশ' টাকার।

'কিন্তু আমি···চাকরি ছাড়া···'

'এ বিষয়ে সংঘ কি করবে। আপস হয়েছে। এখন কি নতুন কিছু করা যায় ? আর আইন অনুসারে আপনি একজন অফিসার। অফিসারকে কোন অবস্থাতেই ওরা সংঘের সভ্য ব'লে মানতে পারে না।'

'উপায় ?' বিবর্ণ মুখে বিমি ব'সে পড়লো টুলটার উপরে।

বিমলা তার কোআর্টার্সে ফিরে এলো। কাঠের বাড়ি। পুরনোও বটে। সস্তা ছিট কাপড়ের পর্দা ফেলা। সাজানো গোছানো দু'খানা ঘর। উপচার আর কোথায় ? বরং যেন এক ধরনের কঠোরতাই।

কিন্তু এই ঘরেই সৌম্য তাকে নতুন জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে। অনেক সন্ধ্যা, অনেক বিকেল থেকে সন্ধ্যা পার হ'য়ে রাত্রি।

না—না সৌম্য সংঘের নেতার মতো অত বড়ো নয়। মনে পড়লো বিমির ম্যানেজার এবং নেতার ভ্রূর গঠনে যেন বেশি রকমের মিল ছিলো। কাঠিন্য, প্রভুত্ব ও কঠোরতা।

আর। বিমলা উঠে গিয়েছিলো আয়নার সামনে। বোঝা যায়। এখনিই তার দোষ নয়। কিছুতেই তার দোষ নয়। এক ধরনের আদিম স্বাধীনতাবোধই বরং জন্মেছিলো তার নিজের। ভেবেছিলো বিমলা, জীবন পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু কোথায় গেলো সে? ধর্মঘটের মধ্যেই একদিন কোথায় চ'লে গেলো সৌম্য। হয়তো অন্য কোন শহরে অন্য কাউকে মিষ্টি ক'রে ডেকে নতুন ধর্মঘটের ব্যবস্থা করছে। এখানকার বিমলা তার কাছে ব্যবহারশেষের মৃৎপাত্র?

বিমলা স্নান করলো না, রান্না করলো না। চোখের জল মুছে, নিজের কোআর্টাসের্র ঘরগুলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যেন সে মুঠি মুঠি ক'রে ধরতে চায়। ঘরের ছিট কাপড়ের পর্দা, ঘরের দেওয়াল। চৌকিতে ব'সে সত্যি সত্যি সে চৌকির ধার চেপে ধরলো। যেন কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাবে—সে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায় ঘরটিকে।

কোথায় যাবে সে, কোথায়? বারান্দায় বেরুতেও সাহস হয় না।

'ম্যানেজার সাব।' বললো ঝি। ফ্যাক্টরির খাতায় শ্রমিক হিসাবে নাম লেখা থাকলেও সে বিমলার ঝি। অন্তত এতদিন তাই ছিলো। শ্রমিক-সংঘের সভ্যা হিসাবে তারও বেড়েছে ধর্মঘটের আপসে।

ম্যানেজার সাব নয়, বড়োবাবু। কোঁচানো চাদর গলায়, আঙুলে অজস্র আংটি।

'বিমলা দেবী, আপনাকে সুখবর দিতে এলাম। ম্যানেজার সাহেবকে ধরে-ছিলাম। কাল থেকে আর তিনদিন আপনাকে থাকতে দিতে রাজী হয়েছেন।'

'তা হ'লে?' আর কিছু বলতে পারলো না বিমলা।

'আপীল ক'রে চাকরি রাখা যায় কিনা তাও দেখতে হবে।'

'আমিও আপনার মতো ওদের পাল্লায় প'ড়ে ঠকেছিলাম একবার। যাক সে কথা।'

বিকেলে এলো বড়োবাবু, সকালেও এলো সে।

ক্যাম্পে কি পথে ফিরে যেতে হবে না যদি সে বড়োবাবুর কথা শুনে চলে। ক্যাম্পে নয়, পথে নয়—সারাদিন এই ভাবলো সে। নিজের আঁচলটা তুলে চোখের সামনে ধ'রে সে মনে করলো কি ময়লাই ছিলো আঁচল, ক্যাম্পে থাকবার সময়ে। শুধু কি একটুকুই?

'আপনার আপন বলতে কেউ নেই, এ খবরও আমি পেয়েছি।' বড়োবাবু বললো।

'সত্যি আমার কেউ নেই।'

কিন্তু সৌম্য? সে কি জানতো না এই ধর্মঘটের মতো ব্যাপারে তাকে জড়িয়ে দেয়া কতখানি অবিমৃষ্যকারিতা? সে কি মুখ দেখাতে পারছে না ব'লেই পালিয়েছে?

'কিন্তু, বাড়তি তিনদিনের আর দু'দিন আছে। যাবেন না থাকবেন?'

চমকে উঠলো বিমলা। মনে হ'লো সে কেঁদে ফেলবে। কোথায় যাবো?

'তা হ'লে নাম বলুন তার। সৌম্য না? সৌম্য গুহ?'

'হ্যাঁ।'

ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

এটা একেবারেই মিথ্যা কথা, শুধু কবি-কল্পনা যে জন্মের আগে ভ্রূণ, তা সে যতই পরিপুষ্ট হ'ক, কখনও তার ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। কল্পনা, কল্পনা। সেটা কান্না ছাড়া কিছুই নয় যা বিমলা অনুভব করেছিলো। গলা বন্ধ হ'য়ে আসছিলো। এ কখনও হ'তে পারে, অন্তঃস্থ ভ্রূণ হাত তুলে তার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলো, সেই অস্বাভাবিক অভিযোগের সময়ে? আসামীর কাঠগড়ায় সৌম্য, আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় সে। শ্রমিকদের উসকানি দিয়েছিলো সেই। শ্রমিকরা সাক্ষ্য দিলো। অনেক বারই তারা এ ধরনের সাক্ষ্য দিয়ে থাকবে। বিমলা শুধু বললো তাকে সংঘ গড়তে পরামর্শ দিয়েছে সৌম্য, তাকে চালিয়েছে সৌম্য, চাকরিও সেই করিয়ে দেয় বড়ুয়ার সুপারিশে।

সৌম্য কিছুই বললো না। কাঠগড়ায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাতে পাকানো কাগজ গুঁড়ো গুড়ো ক'রে কুটি কুটি ক'রে মেঝের উপর ফেলে দিচ্ছিলো সে। চোখ তুলেও সে চায়নি। যেন লজ্জায় তার দৃষ্টি সঙ্কুচিত।

উনুনের ঠিক উপরে শূন্য অন্ধকার ঝিলমিল ক'রে কাঁপছে। চোখ জ্বালা করছে। জল এলে কিছু শান্তি পাওয়া যেতো।

আ, সৌম্য। কিম্বা একি তোমার পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠার পথের সঙ্গে আমার পরিণতির পথের বিরোধ। এই কি অনিবার্য ছিলো। পূর্বনির্ধারিত এমন কিছুই কি ঘটে থাকে?

সময় সময়। আঁদি অন্ত কেউ পায় না। কিন্তু একটি বিন্দুতে সে তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু সে তো অমনিবাস নয় যে ইচ্ছে করলে নামা ওঠা যাবে। সময়ের কম্পনকে যদি বাসের কম্পনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলো তো তোমারই ভুল। সময়ের আশ্রয়বিন্দু থেকে একবার স্খলিত হ'লে আশ্রয় পাওয়া যায় না। যাকে ত্যাগ করেছ তাকে কি আর আপন করে পাওয়া যায়? মরণচাঁদের ছেলেকে নিয়ে তুমি শুধু অনেক কল্পনা করতে পারো। যে সম্বন্ধ তুমি নানা ভাবে মুছে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে দিতে তুমি পারো না।

বিম্মি শুকনো কান্নায় ফোঁপাতে লাগলো।

ভুবনবাবু কখন আহার শেষ ক'রে উঠে গেছে তা সে জানতে পারেনি। তার মনে হ'লো এর চাইতে ভুবনবাবুর সঙ্গে কথা বলা ভালো।

কিন্তু সেও তো এক ধরনের স্থিতি লাভ, কতকটা যেন শান্তিই। নির্বাস কি সেটুকু স্থিতিও পেতে পারে? কালক্রমে পুরনো জালাগুলো জুড়িয়ে আসবে। আরও কিছুদিন জলার জন্য নতুন কিছু তাকে সংগ্রহ ক'রে রাখতেই হবে।

কে যেন হা হা করে কেঁদে উঠলো।

'ও কি?' চমকে উঠলো বিম্মি।

'সেই মা-টিই বোধ হয় কাঁদছে।' ভুবনবাবু বললো।

'মা!'

'ওই নতুন বাড়ির বউটি। সন্ধ্যার পর থেকে তার ছেলেটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই যে চাকা চাল্‌তো।'

'অ্যাঁ?'

'অনেক খোঁজাখুঁজি করছে সকলে।'

বিমলা নিজের ঘরের দিকে ফিরলো।

কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।

কিন্তু এবার সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। অজস্র ধারায় জল এলো আবার তার চোখে। যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারলে ভালো ছিলো।

কিন্তু এখনও রান্নার পাট তোলা হয়নি। রাত হয়েছে। রান্নার পাট না মেটা পর্যন্ত ভুবনবাবুর ঘুম হবে না। কাল তো তার স্কুল আছে।

রান্নার পাট তুলতে গেলো বিম্মি।